ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

করোনা ভাইরাস সংকট মোকাবিলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ: দ্বিতীয় পর্ব

মো. জুলকারনাইন, মোহাম্মদ নূরে আলম, মোরশেদা আক্তার
তাসলিমা আকতার, মনজুর ই খোদা

১০ নভেম্বর ২০২০

করোনা ভাইরাস সংকট মোকাবিলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ: দ্বিতীয় পর্ব

উপদেষ্টা
ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের
উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

গবেষণা দল
মো. জুলকারনাইন, *ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*
মোহাম্মদ নূরে আলম, *ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*
মোরশেদা আক্তার, *ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*
তাসলিমা আকতার, *প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*
মনজুর ই খোদা, *প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
মাইডাস সেন্টার (পঞ্চম ও ষষ্ঠ তলা)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন), (পুরানো ২৭)
ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: +৮৮০ ২ ৪৮১১৩০৩২, ৪৮১১৩০৩৩ , ৪৮১১৩০৩৬
ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৪৮১১৩১০১
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

সূচিপত্র

মুখবন্ধ	১
প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা	২
গবেষণা প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা	২
গবেষণা উদ্দেশ্য	২
গবেষণা পদ্ধতি	৩
গবেষণা আওতা	৩
বিশ্লেষণ কাঠামো	৩
দ্বিতীয় অধ্যায়: করোনা প্রতিরোধে পরিকল্পনা ও কৌশল প্রণয়ন	৫
তৃতীয় অধ্যায়: করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ চিহ্নিতকরণ	৮
চতুর্থ অধ্যায়: করোনা আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসা ব্যবস্থা	১৬
পঞ্চম অধ্যায়: সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ	২০
ষষ্ঠ অধ্যায়: কমিউনিটি পর্যায়ে সংক্রমণ বিস্তার রোধ	২৩
সপ্তম অধ্যায়: সরকারি ক্রয় ও সরবরাহ	২৭
অষ্টম অধ্যায়: করোনা ভাইরাসের প্রভাব মোকাবিলায় প্রণোদনা কর্মসূচি	৩১
নবম অধ্যায়: ত্রাণ ও সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি	৩৪
দশম অধ্যায়: করোনা মোকাবিলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ	৩৭
একাদশ অধ্যায়: উপসংহার	৪০

মুখবন্ধ

দেশে করোনার সংক্রমণের মাত্রা সাম্প্রতিক সময়ে কমে আসলেও এটি এখনো একটি বড় ধরনের স্বাস্থ্য ঝুঁকি হিসেবে বিরাজমান। করোনার প্রভাবে সারা বিশ্বের সাথে সাথে বাংলাদেশেও সরকারি ও বেসরকারি কার্যক্রম স্থবির হয়েছে পড়েছে, এবং স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, কর্মসংস্থানসহ সামগ্রিক অর্থনীতি দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতির সম্মুখীন।

ইতোপূর্বে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় প্রাক-সংক্রমণ প্রস্তুতিমূলক পর্যায়ে ও সংক্রমণ শুরুর প্রথম তিন মাসে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে একটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে যা ১৫ জুন ২০২০ তারিখে প্রকাশিত হয়। উক্ত গবেষণায় সংক্রমণের প্রথম তিন মাসে করোনা ভাইরাস মোকাবিলা কার্যক্রমে সুশাসনের প্রতিটি নির্দেশকের ক্ষেত্রে ব্যাপক ঘাটতি লক্ষ করা যায়, যার ফলে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ প্রত্যাশিত পর্যায়ে রোধ করা সম্ভব হয় নি এবং চিকিৎসা ব্যবস্থাপনায় সংকট সৃষ্টি হয়। পূর্বের গবেষণার ধারাবাহিকতায় করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সরকার কী ধরনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে এবং কী ধরনের নতুন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে তা সুশাসনের আলোকে পর্যবেক্ষণ করার উদ্দেশ্যে টিআইবি এই দ্বিতীয় দফা গবেষণা কার্যক্রমটি পরিচালনা করেছে।

এই গবেষণার বিশ্লেষণে দেখা যায়, করোনা মোকাবিলায় সরকারের গৃহীত কার্যক্রমে পূর্বের চেয়ে কিছু ক্ষেত্রে উন্নতি হলেও করোনা ভাইরাস মোকাবিলা কার্যক্রমে সুশাসনের প্রতিটি নির্দেশকের ক্ষেত্রে এখনো ঘাটতি বিদ্যমান। স্বাস্থ্যখাতে ইতিমধ্যে গভীরভাবে বিস্তৃত দুর্নীতি করোনা সংকটে প্রকটভাবে উন্মোচিত হয়েছে এবং করোনা সংকটকে কেন্দ্র করে দুর্নীতির নতুন ঝুঁকি ও সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এসব অনিয়ম-দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনার কারণে স্বাস্থ্য খাতের ওপর মানুষের অনাস্থা পূর্বের তুলনায় আরও বেড়েছে। একইভাবে সরকারের ত্রাণসহ প্রণোদনা কর্মসূচি থেকেও অনিয়ম-দুর্নীতি ও সুবিধা লাভের প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে, যার কারণে প্রকৃত উপকারভোগীরা বঞ্চিত হচ্ছে। অনিয়ম-দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্তদের মধ্যে ক্ষেত্রবিশেষে কিছু ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলেও তা অনেকাংশে আনুষ্ঠানিকতার নামান্তর, এবং বিশেষকরে উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিরা আড়ালে থেকে যাচ্ছে। তথ্য প্রকাশে বিধিনিষেধ আরোপের মাধ্যমেও অনিয়ম-দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনাকে আড়াল করার প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে।

করোনা ভাইরাসজনিত সংকট মোকাবিলার সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী, স্বাস্থ্যকর্মী, জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এবং বিভিন্ন এলাকার স্থানীয় নাগরিক যারা তাঁদের মূল্যবান মতামত, অভিজ্ঞতা ও বিভিন্ন বিষয়ে পর্যবেক্ষণ তুলে ধরে এই গবেষণা প্রতিবেদনকে তথ্যসমৃদ্ধ করতে সহায়তা করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

এই গবেষণা সম্পন্ন করেছেন টিআইবি'র গবেষক মো. জুলকারনাইন, মোহাম্মদ নূরে আলম, মোরশেদা আক্তার, তাসলিমা আকতার, এবং মনজুর ই খোদা। টিআইবি'র উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের, এবং গবেষণা ও পলিসি বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল হাসান এই গবেষণা কার্যক্রমের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। গবেষণার তত্ত্বাবধান এবং প্রতিবেদন সম্পাদনা ও পরিমার্জন করেছেন সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার শাহজাদা এম আকরাম। এছাড়া মাঠ পর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহ এবং প্রতিবেদন উপস্থাপনার ওপর গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদানের জন্য অন্যান্য সহকর্মীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

এই গবেষণার ফলাফল ও সুপারিশের আলোকে সংশ্লিষ্ট নীতি-নির্ধারকগণ করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা ও কার্যক্রম গ্রহণ এবং এই কার্যক্রমে সুশাসন নিশ্চিত করতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করলে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে। গবেষণা প্রতিবেদন সম্পর্কে পাঠকের পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

প্রথম অধ্যায়
ভূমিকা

১.১ গবেষণা প্রেক্ষপট ও যৌক্তিকতা

করোনা ভাইরাস ডিজিজ, ২০১৯ (কোভিড-১৯) সংক্রামক রোগটি সর্বপ্রথম ডিসেম্বর ২০১৯ সালে চীনের উহান প্রদেশে আবির্ভূত হয় এবং পরবর্তীতে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। এই সংক্রামক রোগটি বর্তমানে বিশ্বব্যাপী অন্যতম জনস্বাস্থ্য সংকট হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। ২০২০ সালের ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত সারা বিশ্বের ১৮৮ টি দেশে চার কোটি ৪২ লক্ষ ২৮ হাজার ৭৩১ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয় এবং ১১ লক্ষ ৮৫ হাজার ৭২১ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে।[১] শুধু স্বাস্থ্য সমস্যাই নয়, সারা বিশ্বে শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও আয়, বৈদেশিক আয়, বিশ্ব বাণিজ্য, খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ের ওপর করোনা ভাইরাসের প্রভাব লক্ষ করা যায়, যা সারা বিশ্বে বিশেষত প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য ক্রমাগত বৃদ্ধি করছে। জুন ২০২০ এ করোনা ভাইরাসের প্রভাব ৭.১ কোটি মানুষকে চরম দারিদ্র্যের দিকে ঠেলে দেয়।[২]

বাংলাদেশে ২০২০ সালের ৮ মার্চ সর্বপ্রথম করোনা আক্রান্ত রোগী পাওয়া যায়; বর্তমানে সারাদেশের ৬৪টি জেলায় এই সংক্রমণ বিস্তার লাভ করেছে। ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত বাংলাদেশে সর্বমোট চার লক্ষ সাত হাজার ৬৮৪ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয় এবং পাঁচ হাজার ৯২৩ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে।[৩] মোট আক্রান্তের সংখ্যার হিসাবে বাংলাদেশ বর্তমানে সারা বিশ্বের মধ্যে ২০ তম অবস্থানে রয়েছে। তবে রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর) ও আইসিডিডিআর,বি-এর একটি যৌথ জরিপের মাধ্যমে জানা যায় জুলাইয়ের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত ঢাকায় আক্রান্তের হার ৪৫ শতাংশ। অর্থাৎ ঢাকার প্রায় এক কোটি মানুষ আক্রান্ত হয়েছে। বিশেষজ্ঞ মতে পরবর্তী তিনমাসে আক্রান্তের হার ৬০-৬৫ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি হয়েছে।[৪] সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও কৃষি, শিল্প-বাণিজ্য, আয় ও কর্মসংস্থান, বৈদেশিক আয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে করোনা ভাইরাসের প্রভাব লক্ষ করা যায়, যা দেশের মানুষ বিশেষত প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে চরম দারিদ্র্যের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। করোনার প্রভাবে ২০১৯-২০ অর্থবছরে দরিদ্র্যের হার ২৯.৫ শতাংশে উন্নীত হয়, যা ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ছিল ২০.৫ শতাংশ। অর্থাৎ এক বছরে নতুন করে নয় শতাংশ (প্রায় ৪৫ লক্ষ) মানুষকে দারিদ্র্যের দিকে ঠেলে দিয়েছে।[৫] তবে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)-এর মতে, করোনার প্রভাবে আয় কমে যাওয়ায় সার্বিকভাবে দরিদ্র্যের হার ৩৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।[৬]

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে জনগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন খাত ও প্রতিষ্ঠান নিয়ে গবেষণা ও অধিপরামর্শমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে, যার মধ্যে স্বাস্থ্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি খাত। ইতোপূর্বে টিআইবি করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় প্রাক-সংক্রমণ প্রস্তুতিমূলক পর্যায়ে ও সংক্রমণ শুরুর প্রথম তিন মাসে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে একটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে যা ১৫ জুন ২০২০ তারিখে প্রকাশিত হয়। উক্ত গবেষণায় সংক্রমণের প্রথম তিন মাসের মধ্যে করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সরকারের গৃহীত কার্যক্রমে সুশাসনের প্রতিটি নির্দেশকের ক্ষেত্রে ব্যাপক ঘাটতি লক্ষ করা যায়। করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় পর্যাপ্ত সময় হাতে পেয়েও প্রস্তুতি ও পরিকল্পনার ঘাটতি, সমন্বয়ের ঘাটতি, সক্ষমতার ঘাটতি, অনিয়ম-দুর্নীতি এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতির কারণে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ বিস্তার লাভ এবং চিকিৎসা ব্যবস্থাপনায় সংকট সৃষ্টি করে। এছাড়া অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবিলায় বিচ্ছিন্নভাবে ত্রাণ বিতরণ এবং মাঠ পর্যায়ের অনিয়ম-দুর্নীতির কারণে প্রকৃত উপকারভোগীরা ত্রাণ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়।

পূর্বের গবেষণার ধারাবাহিকতায় পরবর্তী সময়ে করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সরকার কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে কী ধরনের অগ্রগতি সাধিত হয়েছে এবং কী ধরনের নতুন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তা সুশাসনের আলোকে পর্যবেক্ষণ করার উদ্দেশ্যে টিআইবি এই দ্বিতীয় দফা গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য

---

[১] স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, কোভিড-১৯ সংক্রান্ত পরিস্থিতি, সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, ১ নভেম্বর ২০২০

[২] World bank blog, Updated estimates of the impact of COVID-19 on global poverty, June 8, 2020, বিস্তারিত দেখুন: https://blogs.worldbank.org/opendata/updated-estimates-impact-covid-19-global-poverty

[৩] স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, কোভিড-১৯ সংক্রান্ত পরিস্থিতি, সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, ১ নভেম্বর ২০২০

[৪] দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকার অর্ধেক মানুষের করোনা হয়ে গেছে, ১৩ অক্টোবর, ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: https://www.prothomalo.com/bangladesh/coronavirus/

[৫] *The Daily Star*, 'With Covid-19 hitting the poorest hardest, we must help them recover', 11 September 2020, বিস্তারিত দেখুন: https://www.thedailystar.net/opinion/news/covid-19-hitting-the-poorest-hardest-we-must-help-them-recover-1959185

[৬] প্রথম আলো, "করোনার কারণে দারিদ্র্য বেড়ে ৩৫ শতাংশ হয়েছে: সিপিডি", ৭ জুন, ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: https://tinyurl.com/y9w5l8lw

এই গবেষণার উদ্দেশ্য হচ্ছে করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা।

১.৩ গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণাটি মূলত মিশ্র পদ্ধতিনির্ভর। গুণগত ও পরিমাণগত এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় ধরনের তথ্য এই গবেষণায় ব্যবহার করা হয়েছে।

১.৩.১ প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ও তথ্যের উৎস

জরিপের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ: পরিসংখ্যা বিজ্ঞানের পরীক্ষিত পদ্ধতি আকস্মিক নমুনায়ন (Convenience sampling) পদ্ধতি ব্যবহার করে অনলাইন ও টেলিফোন জরিপের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ, ত্রাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

সারণি ১: গবেষণায় ব্যবহৃত জরিপ পদ্ধতি

জরিপ		নমুনায়ন পদ্ধতি	গবেষণা এলাকা (জেলা)	নমুনার সংখ্যা
স্বাস্থ্যসেবা গ্রহীতা		কোভিড ও নন-কোভিড সেবা গ্রহীতার টেলিফোন ও অনলাইন সাক্ষাৎকার	৪৭	১,০৯১
সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির উপকারভোগী	নগদ অর্থ প্রণোদনা	প্রতিটি এলাকা থেকে ৩০ জন নগদ সহয়তা ও ৩০ জন ওমমএস উপকারভোগী নির্বাচন	৩৫	১,০৫০
	ওমমএস কার্ড		৩২	৯৬০
স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান		গবেষণা এলাকার কোভিডের জন্য নির্ধারিত জেলা পর্যায়ের প্রতিটি হাসপাতালের একাধিক স্বাস্থ্যকর্মীর নিকট হতে যাচাই-বাছাই পূর্বক তথ্য সংগ্রহ	৩৫	৩৭ (মেডিক্যাল কলেজ ৭ ও জেলা হাসপাতাল ৩০)

গুণগত তথ্য সংগ্রহ: মুখ্য তথ্যদাতাদের সাথে টেলিফোন সাক্ষাৎকার এবং ৪৩টি জেলায় স্বাস্থ্যকর্মীদের সাথে অধিপরামর্শমূলক দলীয় আলোচনা হতে গুণগত তথ্য সংগ্রহ কা হয়েছে।

১.৩.২ পরোক্ষ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ও তথ্যের উৎস: সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন কার্যালয়ের তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত তথ্য, এবং গণমাধ্যমে (প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক) প্রকাশিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হয়েছে।

১.৩.৩ গবেষণার তথ্য সংগ্রহের সময়: এই গবেষণায় ১৬ জুন থেকে ১৫ অক্টোবর ২০২০ পর্যন্ত সময়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

১.৪ গবেষণার আওতা

পূর্বের গবেষণার ধারাবাহিকতায় করোনা ভাইরাস এবং এর অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবিলায় গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে নিম্নোক্ত আটটি বিষয়ে এই গবেষণায় তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে-

১. করোনা প্রতিরোধে পরিকল্পনা ও কৌশল প্রণয়ন
২. করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ চিহ্নিতকরণ (পরীক্ষাগার সক্ষমতা, প্রস্তুতি ও পরীক্ষা কার্যক্রম)
৩. করোনা আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসা ব্যবস্থা (হাসপাতালের সক্ষমতা, প্রস্তুতি ও সেবা)
৪. সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ (হাসপাতাল পর্যায়ে স্বাস্থ্যকর্মীর নিরাপত্তা)
৫. কমিউনিটি পর্যায়ে সংক্রমণ বিস্তার রোধ (স্ক্রিনিং, আইসোলেশন, কোয়ারেন্টাইন, লকডাউন)
৬. সরকারি ক্রয় ও সরবরাহ
৭. করোনা ভাইরাসের প্রভাব মোকাবিলায় প্রণোদনা কর্মসূচি
৮. ত্রাণ ও সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি

১.৫ বিশ্লেষণ কাঠামো

এই গবেষণায় করোনা ভাইরাস মোকাবিলা কার্যক্রমের ক্ষেত্রে এবং টিআইবি'র দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে গৃহীত কার্যক্রমের সাথে প্রাসঙ্গিক সুশাসন নির্দেশকসমূহের আলোকে গবেষণায় আওতাভুক্ত বিষয়সমূহকে

বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এসব নির্দেশক হচ্ছে আইনের শাসন, দ্রুত সাড়াদান, সক্ষমতা ও কার্যকরতা, অংশগ্রহণ ও সমন্বয়, জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা, এবং অনিয়ম ও দুর্নীতি।

সারণি ২: গবেষণায় ব্যবহৃত বিশ্লেষণ কাঠামো

সুশাসনের সূচক	অন্তর্ভুক্ত বিষয়
আইনের শাসন	প্রাসঙ্গিক আইন অনুসরণ
সাড়াদান	পরিকল্পনা ও কৌশল প্রণয়ন, পরীক্ষা ও চিকিৎসা সেবার সম্প্রসারণ, চাহিদা নিরূপণ ও ক্রয় পরিকল্পনা, প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নের উদ্যোগ, সম্ভাব্য দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবিলা প্রস্তুতি
সক্ষমতা ও কার্যকরতা	বিভিন্ন কমিটির ভূমিকা, করোনা পরীক্ষা ও চিকিৎসা, ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী
অংশগ্রহণ ও সমন্বয়	আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়, সরকারি ও বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ, স্থানীয় পর্যায়ের অংশগ্রহণ - চাহিদা নিরূপণ
স্বচ্ছতা	তথ্যের উন্মুক্ততা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, তথ্য প্রকাশকারীর সুরক্ষা
অনিয়ম ও দুর্নীতি	স্বাস্থ্যখাতে ক্রয়, নমুনা পরীক্ষা, চিকিৎসা ব্যবস্থা, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ও ত্রাণ বিতরণ
জবাবদিহিতা	নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি, নিরীক্ষা, তদন্ত, দণ্ড প্রদান

দ্বিতীয় অধ্যায়

করোনা প্রতিরোধে পরিকল্পনা ও কৌশল

বাংলাদেশে ৮ মার্চ ২০২০-এ সর্বপ্রথম করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তি চিহ্নিত হয়। কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ এবং কোভিড আক্রান্তদের অসুস্থতা ও মৃত্যু কমিয়ে আনতে বাংলাদেশে ১৬ মার্চ ২০২০ তারিখে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য বিভাগ এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তর 'বাংলাদেশে কোভিড-১৯ এর জন্য প্রস্তুতি ও সাড়াদান পরিকল্পনা' (Bangladesh Preparedness and Response Plan for COVID-19) প্রণয়ন করে,[৭] যা জুলাই মাসে হালনাগাদ করা হয়।[৮] এ পর্যন্ত এই পরিকল্পনার সাতটি সংস্করণ করা হয়েছে।[৯] এই পরিকল্পনায় করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় কাজের আওতা এবং কার্যকরভাবে করোনাভাইরাস প্রতিরোধ, সংক্রমণের দ্রুত বিস্তার রোধ, করোনার ক্ষয়-ক্ষতি পরিমাণ হ্রাস করতে প্রয়োজনীয় সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রধান প্রধান কার্যক্রমের একটি রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়। এছাড়া বাংলাদেশে দুর্যোগ ও মহামারি মোকাবিলার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক দুইটি আইন যথা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২ এবং সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন, ২০১৮ রয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইনে মহামারি সৃষ্টিকারী যে কোনো ব্যাধিকে দুর্যোগ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।[১০] ফলে এই মহামারি মোকাবিলায় এই আইন দুইটিরও প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। এই অধ্যায়ে করোনাভাইরাস মোকাবিলায় গৃহীত বিভিন্ন পরিকল্পনা ও কৌশলের বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ, সমন্বয় ও অংশগ্রহণ এবং বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক আইনের অনুসরণ আলোচনা করা হলো।

২.১ করোনা ভইরাস মোকাবিলা পরিকল্পনা ও কৌশল বাস্তবায়ন

করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় পরিকল্পনা ও কৌশল মূলত দুইটি প্রধান স্তম্ভের ওপর ভিত্তি করে তৈরি - রোগতাত্ত্বিক সাড়া প্রদান এবং স্বাস্থ্য সেবা প্রদান। এই দুইটি স্তম্ভের অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ বাস্তবায়নে ক্রয় ও সরবরাহ, জনসম্পৃক্ততা ও ঝুঁকি বিষয়ক যোগযোগ এবং গবেষণা ইত্যাদি উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রাসঙ্গিক বিষয়। কৌশল ও পরিকল্পনার প্রতিটি বিষয় বাস্তবায়ন, তদারকি, অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং পর্যালোচনা সাপেক্ষে পরিকল্পনার সংস্করণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অংশীজনের ভূমিকা, সমন্বয় ও কার্যকরতার ঘাটতি যথেষ্ট বিদ্যমান।

২.১.১ অংশগ্রহণ ও সমন্বয়ে ঘাটতি

২.১.২ বিভিন্ন কমিটি ও এর কার্যকরতার ঘাটতি

করোনা মোকাবিলায় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মোট কমিটির সংখ্যা বর্তমানে ৪৩টি। জাতীয় পরিকল্পনার তৃতীয় সংস্করণে কমিটি ছিল ১১টি, পঞ্চম সংস্করণে কমিটি কমিয়ে ছয়টি, এবং সপ্তম সংস্করণে পুনরায় কমিটির সংখ্যা বৃদ্ধি করে ১৩টি করা হয়। তবে পরিকল্পনায় কমিটির সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ বা ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। দেশে করোনা বিষয়ক যত কমিটি হয়েছে, বিশ্বের অন্য কোথাও তা দেখা যায় না। এই কমিটিগুলোর মধ্যে অনেক কমিটির কোনো সভা এখনো হয়নি। দেশের একাধিক বিশিষ্টজনকে তাঁদের সম্মতি ছাড়াই কিছু কমিটিতে রাখা হয়েছে। আবার কোনো কমিটি বিলুপ্ত হলেও সদস্যদের তা জানানো হয় নি। কোনো কোনো ব্যক্তির নাম চার-পাঁচটি কমিটিতেও দেখা গেছে।

অনেক কমিটি গঠন করা হলেও এর যে মূল উদ্দেশ্য অর্থাৎ করোনা মোকাবিলায় জাতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন তা যথাযথভাবে হচ্ছে না। জাতীয় পরিকল্পনা অনুযায়ী স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে গঠিত ন্যাশনাল অ্যাডভাইজারি কমিটি করোনা মোকাবিলায় যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারে নি। অনেক সিদ্ধান্ত কমিটির বাইরে থেকে আসার অভিযোগ রয়েছে। করোনাভাইরাস মোকাবিলার সকল কার্যক্রমে কেন্দ্রীভূত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রবণতা চলমান রয়েছে। জাতীয় কমিটিতে ব্যাপক আলোচনা ছাড়াই করোনা মোকাবিলার জাতীয় পরিকল্পনা (ন্যাশনাল প্রিপেয়ার্ডনেস অ্যান্ড রেসপন্স প্ল্যান ফর কোভিড-১৯) অনুমোদিত হয়েছে এবং সাতটি সংস্করণ করা হয়েছে।[১১] পরিকল্পনা অনুযায়ী দেশের সব জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে যে কমিটিগুলো গঠন করা হয়েছিল তা এখনো কার্যকর থাকলেও অধিকাংশ এলাকায় সভা অনিয়মিতভাবে হয়। আটজন জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ নিয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক গঠিত পাবলিক হেলথ অ্যাডভাইজারি কমিটি বিভিন্ন সময়ে করোনা মোকাবিলায় নানা সুপারিশ করলেও অনেক সুপারিশ গ্রহণ করা হয় না বলে কমিটির অভিযোগ। এছাড়া এপ্রিল মাসে গঠিত ১৯ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় কারিগরি পরামর্শক কমিটি এবং এর পাঁচটি উপকমিটির

---

[৭] দৈনিক কালের কণ্ঠ, করোনা মোকাবিলায় সরকারের প্রস্তুতি, স্বাস্থ্য খাতেই দরকার তিন কোটি ডলার, ১ এপ্রিল ২০২০, https://www.kalerkantho.com/print-edition/first-page/2020/04/01/893271

[৮] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ, 'বাংলাদেশে কোভিড-১৯ এর জন্য প্রস্তুতি ও সাড়াদান পরিকল্পনা', জুলাই ২০২০

[৯] দৈনিক প্রথম আলো, করোনা মোকাবিলায় চল্লিশের বেশি কমিটি, কাজ নিয়ে প্রশ্ন, ৮ জুলাই, ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: https://www.prothomalo.com/bangladesh/

[১০] দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২, ধারা ২ (১১) (ই)

[১১] দৈনিক প্রথম আলো, করোনা মোকাবিলায় চল্লিশের বেশি কমিটি, কাজ নিয়ে প্রশ্ন, ৮ জুলাই, ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: https://www.prothomalo.com/bangladesh/

অনেক সুপারিশও গ্রহণ করা হয় নি। যেমন, করোনা সংক্রমণের ব্যাপকতা অনুসারে এলাকা বিভাজন ও লকডাউন, পরীক্ষার সংখ্যা বৃদ্ধি, এন্টিজেন ও এন্টিবডি টেস্টের ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি।

করোনা মোকাবিলায় গঠিত কমিটিগুলোর অধিকাংশ সক্রিয় না থাকা এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কমিটিগুলোর মধ্যে সমন্বয়হীনতার কারণে পরিকল্পনা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা যায় নি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, পরিকল্পনা ছিল মহামারির চতুর্থ স্তরে অর্থাৎ কমিউনিটি ট্রান্সমিশন শুরু হওয়ার পর সব কিছু বন্ধ করা হবে। কিন্তু সংক্রমণের প্রাথমিক অবস্থায় সব কিছু বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং সংক্রমণের ব্যাপক পর্যায়ে এসে সব কিছু খুলে দেওয়া হয়েছে।

২.১.৩ আমলা-নির্ভর তদারকি কমিটি

কোভিড-১৯ প্রতিরোধে এবং আক্রান্ত রোগীদের সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে এবং গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি তদারকি করতে স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ হতে একটি টাস্কফোর্স কমিটি গঠন করা হয়েছে। একজন অতিরিক্ত সচিবকে আহবায়ক করে গঠিত নয় সদস্যের এই টাস্কফোর্সে অন্যান্য সদস্যের মধ্যে রয়েছেন স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের যুগ্মসচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (প্রশাসন), স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (প্রশাসন), অর্থ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (প্রশাসন, অর্থবিভাগ), স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (প্রশাসন, জননিরাপত্তা বিভাগ), স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখার পরিচালক, রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর) এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (জনস্বাস্থ্য-১)।[১২]

এই টাস্কফোর্সের কার্যক্রমের আওতার মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে পরিপত্র, প্রজ্ঞাপন, আদেশ, নির্দেশনা ও যেসব কমটি গঠন করা হয়েছে তাদের কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি তদারকি করা, গণমাধ্যমে প্রকাশিত ও প্রচারিত অভিযোগ ও তথ্য পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ, বিভিন্ন কমিটির সিদ্ধান্তের সমন্বয় করা, যেসব হাসপাতাল ও পরীক্ষাগারে কোভিড পরীক্ষা হয়, তাদের লাইসেন্স পরীক্ষা করা ও সেখানে পর্যাপ্ত জনবল ও পরীক্ষার যথাযথ সুবিধা আছে কিনা যাচাই করা, এবং সরকার-নির্ধারিত ফি যথাযথভাবে আদায় করা হচ্ছে কিনা তা পরিবীক্ষণ করা ইত্যাদি। এসব বিষয় কমিটি দু'মাসে কমপক্ষে একবার সভা করবে। এই টাস্কফোর্সকে করোনা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ এবং করোনা নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব দেওয়া হলেও এখানে একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককেও রাখা হয়নি।

২.২ প্রাসঙ্গিক আইন অনুসরণ না করা

সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য দেশে সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন, ২০১৮ রয়েছে। যা বাস্তবায়নের মাধ্যমে মহামারি করোনাভাইরাস তথা সকল ধরনের রোগ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। এছাড়া দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২ - এ মহামারি সৃষ্টিকারী যে কোনো ব্যাধিকে দুর্যোগ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যা করোনা মোকাবিলার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক আইন হিসেবে রয়েছে।[১৩] এই আইন দুইটি অনুসরণ করা হলে এর বাইরে পৃথকভাবে এত কমিটি গঠনের কোনো প্রয়োজন হতো না। এছাড়া সংক্রামক রোগ আইন অনুসরণ করে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার ক্ষেত্রে আইনগত বাধ্যবাধকতা আরোপ করা যেতো। কিন্তু বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হওয়া সত্ত্বেও বর্তমানেও এই আইন দুইটি যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে না।

২.৩ দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবিলায় প্রস্তুতি

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আশঙ্কা করছে যে, সামনের শীতকালে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ আরও মারাত্মক রূপ নিতে পারে। এবং শীতের আগেই উত্তর গোলার্ধের কিছু দেশে এই সংক্রমণ পুনরায় বাড়তে শুরু করেছে। উত্তর গোলার্ধের দেশ হওয়ায় বাংলাদেশও এই ঝুঁকিতে রয়েছে। বাংলাদেশে দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবিলায় জাতীয় কারিগরি পরামর্শক কমিটির পক্ষ থেকেও পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।[১৪] বাংলাদেশের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ আসন্ন শীতে করোনাভাইরাস-এর দ্বিতীয় ঢেউ কার্যকরভাবে মোকাবিলার জন্য জেলা পর্যায়ের হাসপাতালগুলোতে আইসিইউ এবং প্রয়োজনীয় অক্সিজেন সরবরাহের ব্যবস্থাসহ তাৎক্ষণিক সকল ধরনের চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা নেওয়াসহ সকল ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে বলে দাবি করছেন। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবিলার ক্ষেত্রে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে।

বিশেষজ্ঞ মতে দ্বিতীয় ঢেউ আসার পূর্বেই প্রথম ঢেউটিকে কার্যকরভাবে কমিয়ে আনা প্রয়োজন। কিন্তু বাংলাদেশ প্রথম ধাক্কাই এখনো নিয়ন্ত্রণ করতে পারে নি। প্রথম ঢেউ কতদিন চলবে বা বর্তমান করোনা পরিস্থিতি কী তা অনুধাবন এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার জন্য যে তথ্য-উপাত্ত প্রয়োজন জনস্বাস্থ্যবিদ বা গবেষকগণ সেই তথ্য পাচ্ছেন না। সারা দেশের মাত্র ২৮টি জেলায় করোনার নমুনা পরীক্ষার জন্য পিসিআর-এর মাধ্যমে পরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। নমুনা সংগ্রহ ও রোগ শনাক্তকরণ পরীক্ষা

[১২] বাংলাট্রিবিউন, কোভিড তদারকিতে চিকিৎসক নয়, আমলানির্ভর কমিটি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের!, ২৯ আগস্ট ২০২০ । বিস্তারিত দেখুন: https://www.banglatribune.com/national/news/639567/

[১৩] দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২, ধারা ২ (১১) (ই)

[১৪] দৈনিক ভোরের কাগজ, সেকেন্ড ওয়েভ মোকাবিলায় প্রস্তুতি, তবুও কমেনি শঙ্কা, ১৩ অক্টোবর ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: https://www.bhorerkagoj.com/2020/10/13/

সন্তোষজনকভাবে হচ্ছে না। এছাড়া করোনা পরীক্ষায় মানুষের আগ্রহ কমে গেছে। এ কারণে সংক্রমিত ব্যক্তিরা শনাক্ত হচ্ছে না, ফলে সংক্রমণের সঠিক চিত্র পাওয়া যাচ্ছে না। মানুষের পূর্বের চেয়ে স্বাস্থ্যবিধি বিষয়ক সচেতনতা বাড়লেও যেভাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা উচিত তা মানছে না। স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার ক্ষেত্রে সরকারও জনগণকে অনুপ্রাণিত করতে পারছে না। এক্ষেত্রে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়েরও ঘাটতি লক্ষ করা যাচ্ছে। দ্বিতীয় ঢেউয়ের ক্ষেত্রে জনসমাগম ও চলাচল নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বিশেষত ব্যবসায়ী, তৈরি পোশাক শিল্প ও পরিবহন খাত নিয়ে সরকারের এখনো কোনো পরিকল্পনা লক্ষ করা যায় নি। শীতের সময় এমনিতেও সর্দি-কাশি, ঠাণ্ডা-জ্বর বেশি দেখা যায়। এর সাথে করোনা আক্রান্তের ঢেউ চিকিৎসা ব্যবস্থার ওপর নতুন করে চাপ তৈরি করতে পারে। বন্ধ করে দেওয়া করোনা হাসপাতাল সেকেন্ড ওয়েভ নতুন করে সক্রিয় করাটাও চ্যালেঞ্জ হিসেবে সামনে আসতে পারে।[১৫]

২.৩.১ বেসরকারি পর্যায়ের সম্পৃক্ততা নিশ্চিতে বিলম্ব: করোনা চিকিৎসার ক্ষেত্রে এলাকা ভিত্তিক সংকট বর্তমানেও বিদ্যমান। এই সংকট মোকাবিলায় বিশেষত দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবিলায় এলাকাভিত্তিক করোনা চিকিৎসার সক্ষমতা যাচাই করে তার ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার ভিত্তিতে উক্ত এলাকার বেসরকারি মেডিকেল কলেজ, হাসপাতাল ও ক্লিনিকগুলোকে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের চিকিৎসা ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ এখন পর্যন্ত নেওয়া হয় নি। ঢাকাসহ অন্যান্য শহর এলাকাগুলোতে বিচ্ছিন্ন ও বাণিজ্যিকভাবে বেসরকারি হাসপাতালগুলোতে সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

২.৪ প্রবাসীদের নমুনা পরীক্ষার ক্ষেত্রে পরিকল্পনা ও সমন্বয়ে ঘাটতি

দেশের ১৩টি জেলায় প্রবাসীর সংখ্যা বেশি হলেও প্রবাসীদের জন্য নমুনা পরীক্ষার কেন্দ্র নির্বাচন করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন জেলায় প্রবাসীদের আনুপাতিক হার বিবেচনায় না নিয়ে সারাদেশে প্রবাসীদের জন্য ১৬টি হাসপাতাল বা নমুনা সংগ্রহ কেন্দ্র নির্বাচন করা হয়। ফলে কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ও ঢাকায় বেশি চাপ পড়েছে। যথাসময়ে করোনা নেগেটিভ সনদ জোগাড় করতে না পেরে অনেক প্রবাসী ফ্লাইট মিস করেছে। এছাড়া বিদেশগামীদের করোনা পরীক্ষা বাধ্যতামূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ১৮ দিনের মাথায় সে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা হয়।[১৬] অনেকে এই সনদ না চাইলেও সরকারের এই বারবার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার কারণে প্রবাসীরা হয়রানির শিকার হয় এবং তাদের অতিরিক্ত খরচ হয়।

২.৫ উপসংহার

বাংলাদেশে করোনা মোকাবিলার ক্ষেত্রে এখনো প্রাসঙ্গিক আইনসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় নি। আইনসমূহে দুর্যোগ বা সংক্রামক রোগ মোকাবিলার ক্ষেত্রে বিভিন্ন কমিটির কথা উল্লেখ করা থাকলেও তা কার্যকর না করে বিক্ষিপ্তভাবে অর্ধশতাধিক কমিটি করা হয় যার অধিকাংশ অকার্যকর, এবং এসব কমিটির মধ্যে সমন্বয়হীনতা এখনো উল্লেখযোগ্যভাবে লক্ষণীয়। গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটিগুলোর অনেক ক্ষেত্রে অগ্রাহ্য করে আমলা নির্ভর সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রবণতা এখনো বিদ্যমান। এবং বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা অনুযায়ী আসন্ন শীতে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবিলার ক্ষেত্রে সকল প্রস্তুতি গ্রহণের কথা বলা হলেও বিশেষজ্ঞ মতে তা বাস্তাবয়নে যথেষ্ট চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান।

---

[১৫] দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, করোনার সেকেন্ড ওয়েভ মোকাবিলার প্রস্তুতি প্রয়োজন, ২২ আগস্ট ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: https://tbsnews.net/bangla/

[১৬] ইনকিলাব, ১৮ দিনেই সিদ্ধান্ত বদল, বাড়বে জাল-জালিয়াতি, ৫ আগস্ট ২০২০। বিস্তারিত দেখুন: https://www.dailyinqilab.com/article/311785/

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ চিহ্নিতকরণ

মহামারি বা অতিমারির বর্তমান অবস্থা অনুধাবন করতে নমুনা পরীক্ষা অতীব প্রয়োজনীয়। ভাইরাসের প্রভাব এবং প্রাদুর্ভাব দুর্বল করতে বা হ্রাস করতে করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে এটা একটা প্রধান হাতিয়ার। আক্রান্ত ব্যক্তি চিহ্নিত করা, তাদের পৃথক করা এবং কোয়ারেন্টাইনে রাখা এবং প্রয়োজন অনুসারে চিকিৎসা দেওয়ার জন্য ব্যাপক মাত্রায় নমুনা পরীক্ষা করা প্রয়োজন। প্রকৃত আক্রান্তের সংখ্যা চিহ্নিত করা সম্ভব হলেই কেবল সে অনুসারে চিকিৎসা ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ ও জনবল বরাদ্দ করা সম্ভব হয়। দ্রুত এবং কার্যকরভাবে সংক্রমণ-বাহক (কনট্যাক্ট ট্রেসিং) চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়া প্রাথমিকভাবে আক্রান্তের সংখ্যা হ্রাস করে যা সার্বিকভাবে প্রাদুর্ভাবকে নিয়ন্ত্রণ করতে সহজ করে। কার্যকর কনট্যাক্ট ট্রেসিং এবং আইসোলেশন সার্বিকভাবে প্রাদুর্ভাবের আকার হ্রাস করতে বা দীর্ঘ সময়ের জন্য এটাকে নিয়ন্ত্রণে আনতে সহায়তা করে।[১৭] বাংলাদেশে রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট ২১ জানুয়ারি ২০২০ তারিখ থেকে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের পরীক্ষা করা শুরু করে।[১৮] ২৫ মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশে মাত্র একটি পরীক্ষাগারের মাধ্যমে নমুনা পরীক্ষার কাজ চলমান ছিল। ১৫ জুন ২০২০ পর্যন্ত পরীক্ষাগার বৃদ্ধি করে ৬০টি করা হয় যার মধ্যে ঢাকা জেলায় ছিল ২৭টি। পরীবর্তীতে পরীক্ষগারের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হলেও পরীক্ষার সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে।

৩.১ বাংলাদেশে করোনাভাইরাস পরীক্ষার সক্ষমতা

বাংলাদেশে ১৬ জুন হতে পরবর্তী ৩০ অক্টোবর ২০২০ পর্যন্ত সময়ে পরীক্ষাগারের সংখ্যা ৬০ থেকে ১১৩টিতে বৃদ্ধি করা হয়। বর্তমানে ২৯টি জেলায় নমুনা পরীক্ষাগার রয়েছে। জুন পরবর্তী সময়ে নতুন আটটি জেলায় নমুনা পরীক্ষাগার সম্প্রসারণ করা হয়। পরীক্ষাগারগুলোর মধ্যে ৬৭টি ঢাকা জেলার মধ্যে অবস্থিত এবং বাকি ৪৬টি অন্যান্য জেলা শহরে অবস্থিত। অন্যান্য জেলার মধ্যে চট্টগ্রাম জেলায় সর্বোচ্চ ৮টি পরীক্ষাগার রয়েছে। জুন-পরবর্তী সময়ে বেসরকারি পর্যায়ের বাণিজ্যিকভিত্তিক পরীক্ষাগারের সংখ্যা অধিক বৃদ্ধি পায়। এ সময়ে মোট বৃদ্ধি পাওয়া ৫৩টি পরীক্ষাগারের মধ্যে ৩৪টি বেসরকারি পরীক্ষাগার।

সারণি ৩: বাংলাদেশে করোনা ভাইরাস পরীক্ষার সক্ষমতা

সময়	পরীক্ষাগার আছে এমন জেলার সংখ্যা	মোট পরীক্ষাগার	ঢাকার মধ্যে পরীক্ষাগারের সংখ্যা	বেসরকারি পরীক্ষাগারের সংখ্যা
২৫ মার্চ	১	১	১	-
৩০ এপ্রিল	১৬	৩০	১২	১
৩১ মে	১৯	৫২	২৮	১১
১৫ জুন	২১	৬০	৩০	১৫
৩০ জুন	২২	৬৮	৩৬	২১
৩১ জুলাই	২৩	৮২	৪৬	২৯
৩১ আগস্ট	২৬	৯২	৫৪	৩৫
৩০ সেপ্টেম্বর	২৯	১০৮	৬২	৪৫
৩১ অক্টোবর	২৯	১১৩	৬৭	৪৯

৩.২ পরীক্ষাগার ও নমুনা পরীক্ষার সম্প্রসারণ: সাড়া প্রদানে ঘাটতি

১৫ জুন ২০২০ এর পরবর্তী সাড়ে চার মাসে বাংলাদেশে পরীক্ষাগারের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হলেও (৫৩টি) নমুনা পরীক্ষার সংখ্যা বৃদ্ধি পায় নি, বরং ক্রমশ হ্রাস পেয়েছে। নিচের সারণিতে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে ১৬-৩০ জুন সময়ের মধ্যে দিন প্রতি গড় পরীক্ষার সর্বোচ্চ পর্যায়ে (১৬,৬৬৪টি নমুনা) পৌঁছে। যদিও এই সময়ে পরীক্ষাগারের সংখ্যা ছিল ৬০-৬৮টি (সারণি ৪)। এই সময়ে গড় শনাক্তের সংখ্যাও সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছায় (প্রতিদিন গড়ে ৩,৬৫৮ জন)।

[১৭] Hellewell, JoelSun, Fiona et al.,Feasibility of controlling COVID-19 outbreaks by isolation of cases and contacts, The Lancet Global Health, Volume 8, Issue 4, e488 - e496, *February 28, 2020*, https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(20)30074-7/fulltext

[১৮] রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, ১৭ মার্চ, ২০২০, https://iedcr.gov.bd/covid-19/covid-19-situation-updates

সারণি ৪: দিন প্রতি পরীক্ষা শনাক্তের সংখ্যা এবং শনাক্ত ও মৃত্যু হার

	দিন প্রতি পরীক্ষা	দিন প্রতি শনাক্ত	শনাক্তের হার (%)	মৃত্যু হার (%)
২১ জানুয়ারি-২৫ মার্চ পর্যন্ত*	১২	০.৬	৫.১	১২.৮
২৬ মার্চ- ১৫ এপ্রিল	৬৫৩	৫৭	৮.৭	৩.৮
১৬-৩০ এপ্রিল	৩,৩২০	৪২৯	১২.৯	১.৮
১-১৫ মে	৬,৩৯০	৮২৭	১২.৯	১.০
১৬-৩১ মে	৯,৩১৬	১,৬৯৩	১৮.২	১.৩
১-১৫ জুন	**১৩,৮৩৮**	**২,৮৯৮**	**২০.৯**	**১.৩**
১৬-৩০ জুন	১৬,৬৬৪	৩,৬৫৮	২১.৯	১.২
১-১৫ জুলাই	১৪,২৬৩	৩,২০৭	২২.৫	১.৩
১৬-৩১ জুলাই	১২,২৭৫	২,৭৫৪	২২.৪	১.৫
১-১৫ আগস্ট	১০,৯৯০	২,৪৫৮	২২.৪	১.৪
১৬-৩১ আগস্ট	১৩,০৪১	২,৪০৪	১৮.৪	১.৭
১-১৫ সেপ্টেম্বর	১৩,৭৭০	১,৮৭১	১৩.৬	১.৯
১৬-৩০ সেপ্টেম্বর	১২,৬৬১	১,৬৮৮	১৩.৩	১.৮
১-১৫ অক্টোবর	১১,১৮৯	১,৩০১	১১.৬	১.৭
১৬-৩১ অক্টোবর	১৩,৯৬৭	১,৫৪৫	১১.১	১.৩

চিত্র ১ এবং চিত্র ২-এ দেখা যায় যে, ১৫ জুন ২০২০ এর পরবর্তী সময়ে যখনই পরীক্ষার সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে তখনই শনাক্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। আবার পরীক্ষার পরিমাণ হ্রাসের সাথে সাথে শনাক্তের সংখ্যাও হ্রাস পেয়েছে।

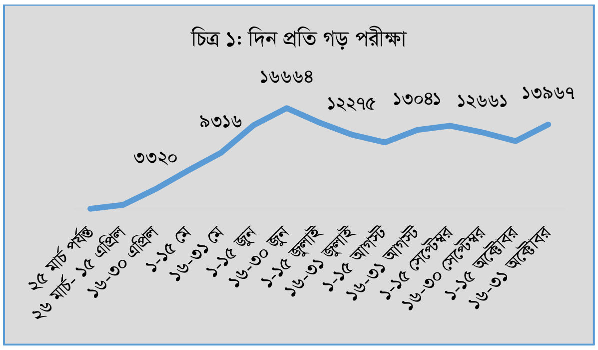

চিত্র ১: দিন প্রতি গড় পরীক্ষা

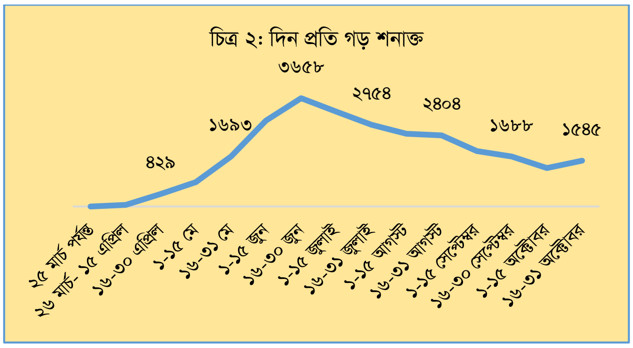

চিত্র ২: দিন প্রতি গড় শনাক্ত

একটি দেশে পর্যাপ্ত পরীক্ষা হচ্ছে কিনা তা আক্রান্ত ব্যক্তির শনাক্তের হার (Positivity rates) নির্দেশ করে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশনা অনুযায়ী একটি দেশে শনাক্তের হার মোট নমুনা পরীক্ষার ৫ শতাংশ হওয়া উচিত। এর বেশি হলে উক্ত দেশ শুধু আক্রান্ত ব্যক্তিকে পরীক্ষা করা হচ্ছে অর্থাৎ যেসব করোনা আক্রান্ত ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করতে গিয়েছে শুধু তাদের পরীক্ষা করা হচ্ছে বলে নির্দেশ করে। এ থেকে বোঝা যায়, করোনা সংক্রমণ চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট উদ্যোগ নেওয়া হয় নি। শনাক্তের হার বৃদ্ধি পেলে বোঝা যায় যে পর্যাপ্ত পরিমাণ পরীক্ষা করা হচ্ছে না। অর্থাৎ কোনো ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়াই ভাইরাসের সংক্রমণ বিস্তার লাভ করছে এবং যা ভবিষ্যতের আক্রান্তের হার বৃদ্ধির দিকে ঈঙ্গিত করে। যদি পরীক্ষা বৃদ্ধির ফলে শনাক্তের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায় তাহলে শনাক্তের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে শনাক্তের হারের লাইন সমান বা ও ক্রমহ্রাসমান দেখায়। আর যদি সংক্রমণ বৃদ্ধির কারণে শনাক্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় তাহলে উক্ত সময়ের শনাক্তের হারের লাইন ক্রমবর্ধমান দেখায়।[১৯]

* ২৫ মার্চ, ২০২০ পর্যন্ত সারাদেশে মাত্র একটি পরীক্ষাগার দিয়ে পরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে

[১৯] জনহপকিন্স ইউনিভার্সিটি অব মেডিসিন, করোনাভাইরাস রিসোর্স সেন্টার, বিস্তারিত দেখুন: https://coronavirus.jhu.edu/testing/tracker/overview

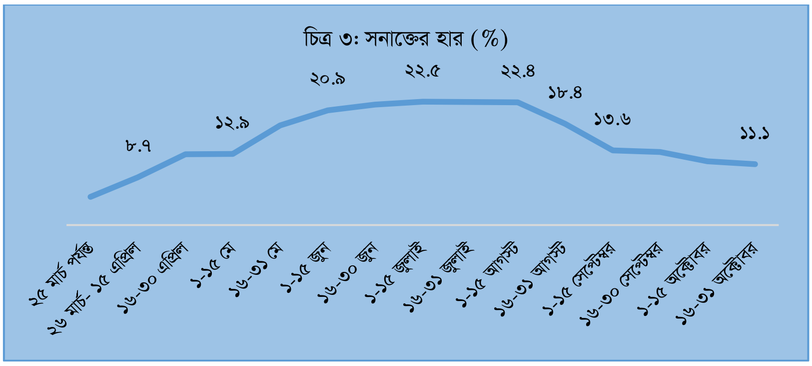

বাংলাদেশে ১৬ জুন থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত গড় শনাক্তের হার ছিল ১৭.৪%। জুন ১৫ থেকে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত শনাক্তের হার ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ৩ আগস্ট ২০২০ তারিখে শনাক্তের হার বাংলাদেশে সর্বোচ্চ ৩২ শতাংশ ছিল। অর্থাৎ এই সময়ে বাংলাদেশে ব্যাপক সংক্রমণ হওয়া সত্ত্বেও পর্যাপ্ত পরীক্ষা করানো হয় নি। পরবর্তীতে ১৬-৩১ আগস্ট সময়কালে পরীক্ষার সংখ্যা যখন পুনরায় বৃদ্ধি করা হয়েছে তখন শনাক্তের হার আবার হ্রাস পেয়েছে। এ থেকে ধারণা করা যায়, উক্ত সময়ে সংক্রমণের হ্রাসের কারণে শনাক্তের পরিমাণ হ্রাস হয় নি। বর্তমান সময়ে শনাক্তের হার হ্রাস পেলেও এখনো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশিত হারের চেয়ে অনেক বেশি রয়েছে (১১.১%)। অপর্যাপ্ত পীক্ষার ফলে বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ কোন পর্যায়ে আছে তা অনুধাবন করা সম্ভব হয় নি, এবং আক্রান্ত ব্যক্তিদের উল্লেখযোগ্য অংশ পরীক্ষার আওতায় আসে নি বলে প্রতীয়মান হয়।

৩.২.১ করোনা পরীক্ষার ক্ষেত্রে সংকোচনমূলক নীতি গ্রহণ

করোনা ভাইরাস নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধের জন্য দ্রুততার সাথে আক্রান্ত ব্যক্তি চিহ্নিত করা, তাদের পৃথক করা এবং কোয়ারেন্টাইনে রাখা এবং প্রয়োজন অনুসারে চিকিৎসা দেওয়ার মাধ্যমে এর ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতির মাত্রা কমিয়ে আনতে ব্যাপক নমুনা পরীক্ষা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নমুনা পরীক্ষা বৃদ্ধি করতে প্রণোদনাসহ বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে দেখা যায়। ভারতে পরীক্ষার সংখ্যা বৃদ্ধি করতে বিভিন্ন এলাকার বিভিন্ন মেডিক্যাল প্রতিষ্ঠানে ১৪টি মেন্টর প্রতিষ্ঠান তৈরি করে যা তাদের নিজ এলাকার সরকারি ও বেসরকারি পরীক্ষাগারগুলোকে মেন্টরিং করে তাদের মধ্যে একধরনের নেটওয়ার্ক তৈরির মাধ্যমে পরীক্ষার সম্প্রসারণ, নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে তৃণমূল পর্যায়ে পরীক্ষার ব্যবস্থা, ব্যাপক মাত্রায় এন্টিজেন পরীক্ষা, মান নিশ্চিতে নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি ব্যবস্থা, দ্রুততার সাথে উপকরণ ও যন্ত্রপাতির চাহিদা নিরূপণ ও সরবরাহে ওয়েবভিত্তিক সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থাপনা প্রচলন, পরিস্থিতি বিবেচনায় দুই দফা বেসরকারি পরীক্ষার ফি হ্রাস ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।[২০] ভারত এপ্রিল মাসের এক তারিখ দিনে চার হাজার পরীক্ষার সক্ষমতা[২১] হতে অক্টোবর ১ তারিখে দিনে ১৫ লক্ষ পরীক্ষার সক্ষমতা অর্জন করেছে।[২২] এছাড়া অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়া প্রদেশে নমুনা পরীক্ষার প্রতিবেদন না পাওয়া পর্যন্ত আইসোলেশনের জন্য ৪৫০ অস্ট্রেলিয়ান ডলার এবং আক্রান্ত হিসেবে শনাক্ত হলে বা আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে আসলে তাকে আইসোলেশনে থাকতে উৎসাহ দিতে ১৫০০ অস্ট্রেলিয়ান ডলার প্রণোদনা ঘোষণা করা হয়।[২৩]

অন্যান্য দেশের পরীক্ষার তুলনায় বাংলাদেশ এখনো অনেক পিছিয়ে আছে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৫ জুনের মতো এখনো ৭ম অবস্থানেই আছে।

---

[২০] বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, How India scaled up its laboratory testing capacity for COVID19, বিস্তারিত দেখুন: https://www.who.int/india/news/feature-stories/detail/how-india-scaled-up-its-laboratory-testing-capacity-for-covid19

[২১] The Economics Times, From 4,000 tests on April 1, India hits 2 lakh daily COVID testing target, 24 June 2020, Read more at: https://economictimes.indiatimes.com/industry/healthcare/biotech/healthcare/from-4000-tests-on-april-1-india-hits-2-lakh-daily-covid-testing-target/articleshow/76542553.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst

[২২] Financial Express, Coronavirus update: India exceeds number of daily COVID-19 tests advised by WHO by over five times, says Centre, 2 October, 2020, https://www.financialexpress.com/lifestyle/health/coronavirus-update-india-exceeds-number-of-daily-tests-advised-by-who-by-over-five-times-says-centre/2096472/

[২৩] The Department of Health and Human Services, Victoria State Government, Australia, https://www.dhhs.vic.gov.au/financial-support-coronavirus-covid-19

সারণি ৫: দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি দেশের জনসংখ্যার অনুপাতে পরীক্ষা, আক্রান্ত ও মৃত্যুর হারের তুলনামূলক চিত্র

অবস্থান	দেশ	জনসংখ্যার অনুপাতে পরীক্ষার হার (%)	
		১৫ জুন ২০২০	৩১ অক্টোবর ২০২০
১	মালদ্বীপ	৫.৪	২৭.৭
২	ভুটান	২.৭	২২.০
৩	ভারত	০.৪	৭.৮
৪	নেপাল	১.০	৪.৯
৫	পাকিস্তান	০.৪	২.০
৬	শ্রীলংকা	০.৪	২.২
৭	**বাংলাদেশ**	০.৩	১.৫
৮	আফগানিস্তান	০.১	০.৩

আক্রান্তের দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বের মধ্যে ১৯তম অবস্থানে থাকলেও জনসংখ্যার অনুপাতে পরীক্ষার হারের দিক থেকে বাংলাদেশ অবস্থান বিশ্বের মধ্যে ১৬২তম। ১৫ জুন-এ এই অবস্থান ছিল ১৪৯তম। বাংলাদেশসহ যেসব দেশে পরীক্ষার হার কম সেসব দেশে শনাক্তের উচ্চ হার লক্ষ করা যায়। আক্রান্তের সংখ্যার দিক হতে প্রথম বিশটি দেশের মধ্যে বাংলাদেশে পরীক্ষার হার সবচেয়ে কম।

সারণি ৬: বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের অবস্থান*

দেশ	আক্রান্তের হিসাবে অবস্থান	জনসংখ্যার অনুপাতে পরীক্ষার হার (%)	করোনা শনাক্ত হার (পজিটিভ রেট)	মৃত্যু হার
যুক্তরাষ্ট্র	১	৪৩.১	৬.৫	২.৫
ভারত	২	৭.৮	৭.৬	১.৫
ব্রাজিল	৩	১০.৩	২৫.২	২.৯
রাশিয়া	৪	৪১.০	২.৭	১.৭
ফ্রান্স	৫	২৪.২	৮.৪	২.৭
স্পেন	৬	৩৫.৭	৭.৬	২.৮
আর্জেন্টিনা	৭	৬.৬	৩৮.৮	২.৭
কলম্বিয়া	৮	৯.৮	২১.৩	২.৯
যুক্তরাজ্য	৯	৪৯.২	৩.০	৪.৭
বাংলাদেশ	২০	১.৫	১৭.৫	১.৫
বৈশ্বিক হার	-	১০.৫	৫.৬	২.৬

* ৩১ অক্টোবর ২০২০ তারিখের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ

বাংলাদেশের 'জাতীয় প্রস্তুতি ও সাড়াদান পরিকল্পনা'য় সংক্রমণ বিস্তারের সাথে সাথে সংক্রমণের ঝুঁকিতে থাকা ব্যক্তির পরীক্ষা, সংক্রমণের প্রবণতা অনুধাবন এবং অন্যান্য কৌশলের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করতে সারা দেশব্যাপি পরীক্ষার সক্ষমতা বৃদ্ধি/সম্প্রসারণের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সারাদেশে মাত্র ২৯টি জেলায় পরীক্ষাগার করা হয়েছে। ১৫ জুন-পরবর্তী সময়ে 'কারিগরি পরামর্শক কমিটি'সহ বিশেষজ্ঞ কর্তৃক প্রতি দিনে ২৫-৩০ হাজার পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে।[২৪] কিন্তু পরীক্ষাগারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও এখন পর্যন্ত একদিনেও ২০ হাজারের বেশি পরীক্ষা করতে পারে নি। ২৬ জুন ২০২০ তারিখে সর্বোচ্চ ১৮,৪৯৮টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়।[২৫] ১ জুলাই হতে ৩১ জুলাই পর্যন্ত বাংলাদেশে শনাক্তের হার সর্বোচ্চ পর্যায়ে (গড়ে ২২.৫%) পৌঁছায় (চিত্র ৩), অর্থাৎ এই সময়ে পরীক্ষার প্রয়োজন সর্বোচ্চ অবস্থায় ছিল। কিন্তু উক্ত সময়ে জেলা পর্যায়ে পরীক্ষার সুবিধা সম্প্রসারণ না করে এবং সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও পরীক্ষার সংখ্যা বৃদ্ধি না করে বাংলাদেশে বিপরীতমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে একটি পরিপত্রে উপসর্গবিহীন ব্যক্তির নমুনা পরীক্ষাকে 'অপ্রয়োজনীয়' হিসেবে উল্লেখ ও পরীক্ষার চাপ কমাতে ২৯ জুন হতে সরকারি পরীক্ষাগারে ২০০ টাকা ফি নির্ধারণ করা হয়।[২৬] পরবর্তীতে সমালোচনার মুখে ফি ১০০ টাকা করা

[২৪] দৈনিক প্রথম আলো, ফি নির্ধারণসহ আট কারণে নমুনা পরীক্ষা কমেছে, ২৭ জুলাই, ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: https://www.prothomalo.com/bangladesh/

[২৫] স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, কোভিড-১৯ সংক্রান্ত পরিস্থিতি, সংবাদ বিজ্ঞপ্তি হতে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ

[২৬] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, কোভিড-১৯ পরীক্ষা-নিরীক্ষার ইউজার ফি'র হার নির্ধারণ, ২৮ জুন ২০২০, স্মারক নং-৪৫.০০.০০০০.১৫৫.৯৯.০১৪.১৮-৪৯২

হলেও পুরো প্রত্যাহার করা হয় নি।[২৭] চিত্র ১ ও ২ এ দেখতে পাওয়া যায় যে ফি নির্ধারণের পর থেকেই ক্রমাগত পরীক্ষার সংখ্যা কমতে থাকে এবং নমুনা শনাক্তের সংখ্যাও কমতে থাকে। সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর) এবং আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশের (আইসিডিডিআরবি) একটি যৌথ গবেষণায় দেখা যায়, ঢাকা শহরের করোনা আক্রান্ত ব্যক্তিদের ৮২ শতাংশ উপসর্গবিহীন।[২৮] করোনা আক্রান্ত বিপুল সংখ্যক উপসর্গবিহীন এই ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে আইসোলেশন না করে পরীক্ষার আওতার বাইরে রাখা হচ্ছে। তারা এ বিষয়ে না জেনে নিজের অজান্তে সংক্রমণ ছড়িয়ে যাচ্ছে এবং অন্যের মৃত্যুর কারণ হচ্ছে। অথচ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কোনো ধরনের বৈজ্ঞানিক গবেষণাভিত্তিক তথ্য-উপাত্ত এবং বিশেষজ্ঞ মতামত না নিয়েই উপসর্গহীন ব্যক্তিদের পরীক্ষা করাকে অপ্রয়োজনীয় হিসেবে ঘোষণা করে।

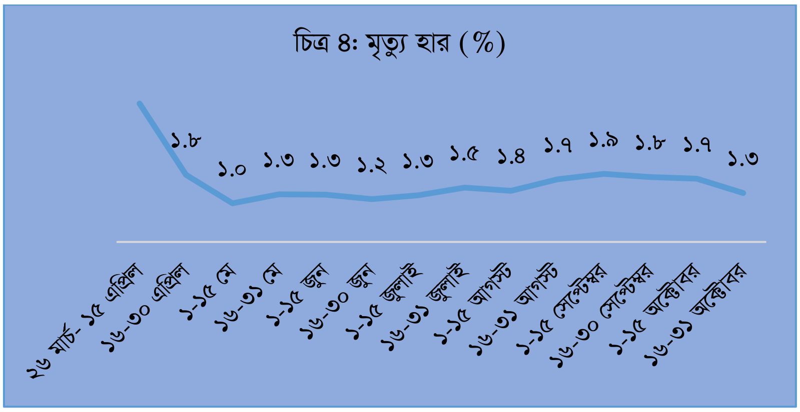

অবৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষা হ্রাসের এই সিদ্ধান্তের ফলে ৩০ জুনের পর থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মৃত্যুহারকে ক্রমবর্ধমান হিসেবে দেখতে পাওয়া যায়।

৩.২.২ পরীক্ষাগার সম্প্রসারণ: কৌশলগত ঘাটতি এবং এলাকা ও শ্রেণিভিত্তিক বৈষম্য

সারাদেশে মাত্র ২৯টি জেলায় পরীক্ষার সুবিধা রয়েছে এবং বাকি জেলাগুলোর আক্রান্ত ব্যক্তিদের অন্য জেলা হতে পরীক্ষা করাতে হয়। যেসব জেলায় পরীক্ষাগার করা হয়েছে তা কোন ভিত্তিতে করা হয়েছে সে বিষয়ে পরিস্কার ধারণা পাওয়া যায় না। জেলা পর্যায়ে পরীক্ষাগার করার ক্ষেত্রে আক্রান্তের সংখ্যা ও শনাক্তের হার বিবেচনা করা হয় নি। অনেক জেলায় পরীক্ষাগারের প্রয়োজনীয়তা থাকা সত্ত্বেও সেখানে পরীক্ষাগারের ব্যবস্থা করা হয় নি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, পঞ্চগড়, মুন্সিগঞ্জ এবং বান্দরবানে শনাক্তের হার যথাক্রমে ২৫.৩, ২৪.০ এবং ২২.৮ শতাংশ। উচ্চ শনাক্তের হার নির্দেশ করছে যে এই জেলাগুলোতে পর্যাপ্ত পরীক্ষা হচ্ছে না, কিন্তু এই জেলাগুলোতে কোনো পরীক্ষাগারের ব্যবস্থা করা হয় নি। অন্যদিকে সিরাজগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও নোয়াখালী জেলায় শনাক্তের হার যথাক্রমে ৩.১, ৪.১ এবং ৪.৬ শতাংশ অথচ এখানে পরীক্ষাগারের ব্যবস্থা রয়েছে।[২৯]

সারাদেশে বিভিন্ন জেলায় উচ্চমাত্রার শনাক্ত হার বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও ১৫ জুন ২০২০ এর পরবর্তী সময়ে ৬০ টি পরীক্ষাগার হতে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত সময়ে নতুন ৫৩টি পরীক্ষাগার বৃদ্ধি করে মোট পরীক্ষাগারের সংখ্যা করা হয় ১১৩টি। যার অধীকাংশই ঢাকার মধ্যে (৬৭টি) এবং ঢাকার বাইরে অন্যান্য জেলায় ৪৬টি। ঢাকার বাইরে চট্টগ্রামে সর্বোচ্চ ৮টি পরীক্ষাগার রয়েছে। অর্থাৎ ঢাকা ও চট্টগামে ৬৬ শতাংশ (৭৫টি) পরীক্ষাগার অবস্থিত। গবেষণার এই সময়ে ঢাকার মধ্যে নতুন করে ৩৭টি পরীক্ষাগার যুক্ত হয় এবং ঢাকার বাইরে মাত্র ১৬টি নতুন পরীক্ষাগার যুক্ত হয়। এবং মাত্র নতুন আটটি জেলায় পরীক্ষাগার সম্প্রসারণ করা হয় (২১টি জেলা হতে ২৯টি জেলা)। এছাড়া এই সময়ে নতুন ৩৪টি বেসরকারি পরীক্ষাগারকে অনুমোদন দেওয়ার মাধ্যমে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত বেসরকারি বাণিজ্যিক পরীক্ষাগারের সংখ্যা বেড়ে হয় ৪৯টি। পক্ষান্তরে এই সময়ে মাত্র ১৯টি নতুন সরকারি পরীক্ষাগার যুক্ত করে মোট সরকারি পরীক্ষাগারের সংখ্যা বেড়ে হয় ৬৪টি। সরকারি পরীক্ষাগারে ফি নির্ধারণ, বেসরকারি পরীক্ষাগারের সংখ্যা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি এবং জেলা পর্যায়ে পরীক্ষাগার সম্প্রসারণ না করার মাধ্যমে কার্যত শহরকেন্দ্রিক স্বচ্ছল ব্যক্তিদের করোনা পরীক্ষায় প্রবেশগম্যতা বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং দরিদ্র, প্রান্তিক ও দুর্গম এলাকার জনগোষ্ঠীর জন্য সেবা সীমিত করার মাধ্যমে নমুনা পরীক্ষার ক্ষেত্রে তাদের নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। এভাবে পরীক্ষার সংখ্যা হ্রাসের মাধ্যমে শনাক্তের সংখ্যা কম হওয়াকে রাজনৈতিক সাফল্য হিসেবে প্রচারের অভিযোগ রয়েছে।[৩০]

---

[২৭] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, কোভিড-১৯ পরীক্ষা-নিরীক্ষার ইউজার ফি'র হার নির্ধারণ, ২০ আগস্ট, স্মারক নং-৪৫.০০.০০০০.১৫৫.৯৯.০১৪.১৮-৭০১

[২৮] দৈনিক প্রথম আলো, 'ঢাকার অর্ধেক মানুষের করোনা হয়ে গেছে', ১৩ অক্টোবর ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: https://www.prothomalo.com/bangladesh/coronavirus/

[২৯] World Health Organization (WHO), Bangladesh, More details: 26 October 2020 Morbidity and Mortality Weekly Update (MMWU) No35, https://www.who.int/bangladesh/emergencies/coronavirus-disease-(covid-19)-update/

[৩০] দৈনিক দেশ রূপান্তর, মন্ত্রীর ভ্যাকসিন বক্তব্যে বিস্ময়, ১৭ আগস্ট, ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: https://www.deshrupantor.com/first-page/2020/08/17/239179

৩.৩ পরিকল্পনা ও কৌশল প্রণয়নে ঘাটতি

বিশেষজ্ঞরা সংক্রমণের 'দ্বিতীয় প্রবাহের' পূর্বাভাস দিলেও তা মোকাবিলায় করোনা পরীক্ষার ক্ষেত্রে কী ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন সে বিষয়ক যথাযথ পরিকল্পনার ঘাটতি রয়েছে। যেহেতু পর্যাপ্ত পরীক্ষার মাধ্যমে বর্তমান সংক্রমণের ব্যাপকতা এখনো পর্যন্ত অনুদঘাটিত হয় নি।

দেশে প্রতিদিন করোনা শনাক্তের পরীক্ষার সংখ্যা ১০ হাজারের নিচে নেমে গেছে। বিভিন্ন কারণে অনেকেই করোনা পরীক্ষায় আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। ফলে, অনেক রোগীই শনাক্তের বাইরে থেকে যাচ্ছে। দেশের কত মানুষ করোনা আক্রান্ত হয়েছে বা জনগোষ্ঠী, অঞ্চল ও পেশাভিত্তিক সংক্রমণ হার কত তা এন্টিবডি পরীক্ষার মাধ্যমে জানা যায়। এর ফলে করোনা মোকাবিলায় সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হয়। করোনা সংক্রমণের সঠিক চিত্র পেতে এবং দ্রুততার সাথে আক্রান্ত ব্যক্তি চিহ্নিত করতে করোনার এন্টিবডি ও এন্টিজেন পরীক্ষা খুব জরুরি। এছাড়া ভ্যাকসিনের সুষ্ঠু প্রয়োগের ক্ষেত্রেও এন্টিবডি পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। অথচ এ বিষয়ে এখনো সরকারের সিদ্ধান্তহীনতা লক্ষ করা যায়। গত ৩ জুন কারিগরি পরামর্শ কমিটি আরটি-পিসিআর পরীক্ষার পাশাপাশি এন্টিবডি ও এন্টিজেন পরীক্ষার জন্য সুপারিশ করে। এবং জুলাই মাসের শুরু থেকে র‍্যাপিড টেস্ট, এন্টিজেন ও এন্টিবডির নীতিমালা তৈরির কাজ সরকার শুরু করলেও এখনো তা চালু হয় নি।[৩১] ২১ সেপ্টেম্বর ২০২০ এ এন্টিজেনের অনুমোদন দিলেও[৩২] এখনও পরীক্ষা শুরু করা সম্ভব হয় নি এবং এন্টিবডি টেস্টের অনুমোদন ৩১ অক্টোবর পর্যন্তও দেওয়া হয় নি।[৩৩]

৩.৪ নমুনা পরীক্ষায় সক্ষমতায় ঘাটতি

১৫ জুন-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে পরীক্ষাগারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও নমুনা পরীক্ষার সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে, যার অন্যতম একটি কারণ হচ্ছে সক্ষমতার ঘাটতি। ১৬ জুন থেকে প্রতিদিন গড়ে ১১টি করে পরীক্ষাগারে কোনো পরীক্ষা হচ্ছে না। ২ আগস্ট ২০২০ তারিখে সর্বোচ্চ ৩৮টি এবং ১৭ অক্টোবরে ৩৪ টি পরীক্ষাগারে কোনো পরীক্ষা হয় নি।[৩৪] পরীক্ষাগারগুলোতে নিয়মিতভাবে পরীক্ষা না হওয়ার কারণের মধ্যে পরীক্ষাগারে যান্ত্রিক ত্রুটি, পরীক্ষাগার রক্ষণাবেক্ষণ, পরীক্ষাগারে ভাইরাসের সংক্রমণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। অনেক ক্ষেত্রে নমুনা সংগ্রহ বেশি না হলে বেসরকারি ল্যাব পরীক্ষাগার বন্ধ রাখে।

৩.৫ নমুনা পরীক্ষার ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতার অভিজ্ঞতা: হয়রানি, অনিয়ম ও দুর্নীতি

করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তি যদি চিহ্নিত না হয় এবং তাদের যদি আইসোলেশন না করা হয় তাহলে ঐ সকল ব্যক্তি তাদের নিজের অজান্তে কমিউনিটিতে করোনা ভাইরাস ছড়াতে থাকে। ফলে আক্রান্ত ব্যক্তি এবং সংক্রমণ-বহনকারী চিহ্নিত করাটা জরুরি। পর্যাপ্ত পরীক্ষা না করালে নীরবে সংক্রমণ ছড়াতে থাকে, জটিল রোগীর সংখ্যা বাড়তে থাকে, প্রাদুর্ভাব বাড়তে থাকে এবং তা নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। আবার নমুনা পরীক্ষা তখনই কার্যকর হবে যখন পরীক্ষার প্রতিবেদন তাড়াতাড়ি পাওয়া যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষের করোনা শনাক্ত না হয় ততদিন কেউ নিজেদের আইসোলেশনে রাখতে চায় না। পরীক্ষার ফল জানতে মানুষকে দীর্ঘ দিন অপেক্ষা করতে হলে প্রতিবেদন পাওয়ার আগ পর্যন্ত তারা অনেক মানুষকে আক্রান্ত করে ফেলে। ফলে দ্রুততার সাথে প্রতিবেদন দেওয়াটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

চিত্র ৫: নমুনা পরীক্ষার প্রতিবেদন পেতে সেবা গ্রহীতদের অপেক্ষার সময় (%)

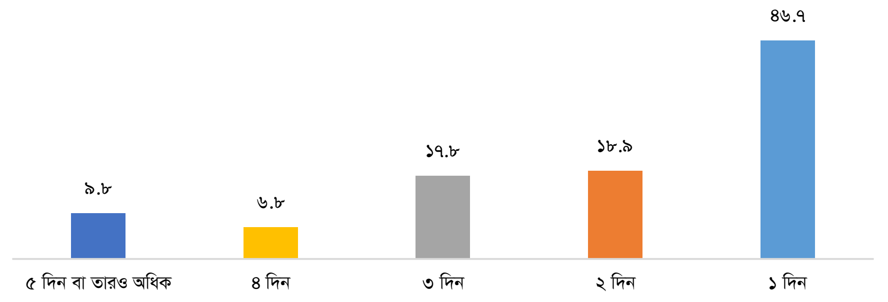

[৩১] দৈনিক প্রথম আলো, সুপারিশ আমলে নেয় নি সরকার, ২৬ আগস্ট, ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: https://www.prothomalo.com/bangladesh/coronavirus/

[৩২] বিবিসি বাংলা, করোনা ভাইরাস: অ্যান্টিজেন র‍্যাপিড টেস্টের অনুমতি - সুবিধা কী, কীভাবে কাজ করবে, কতটা নির্ভরযোগ্য, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: https://www.bbc.com/bengali/news-54232336

[৩৩] ইনডিপেন্ডেন্ট, সঠিক সংক্রমণের চিত্র পেতে এন্টিবডি টেস্ট জরুরি, ৫ অক্টোবর, ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: http://www.independent24.com/details/67347/

[৩৪] স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, কোভিড-১৯ সংক্রান্ত পরিস্থিতি, সংবাদ বিজ্ঞপ্তি হতে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ

গবেষণার জরিপে দেখা যায় যে, এখনো ৩৪.৪ শতাংশ সেবাগ্রহীতাকে ৩ বা ততোধিক দিন প্রতিবেদনের জন্য অপেক্ষা করতে হয় (চিত্র ৫)। এখনো ৩৫টি জেলায় পরীক্ষাগার না থাকা এবং পরীক্ষাগারগুলোর সক্ষমতার ঘাটতির কারণে এই বিলম্ব হচ্ছে। ফলে আক্রান্ত ব্যক্তি যারা প্রতিবেদন দেরিতে পাচ্ছেন, তাদের দ্বারা অপেক্ষার কয়েকদিন অন্যকে সংক্রমণ করার ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে। দীর্ঘ অপেক্ষা ছাড়াও সেবাগ্রহীতারা করোনা পরীক্ষা করাতে হয়রানিসহ নানা ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার হচ্ছে। এছাড়াও জরিপে সেবাগ্রহীতার ৯.৯ শতাংশ নমুনা পরীক্ষায় ভুল প্রতিবেদন পাচ্ছে।

চিত্র ৬: নমুনা পরীক্ষার ক্ষেত্রে অনিয়ম-দুর্নীতি (সেবাগ্রহীতার %)

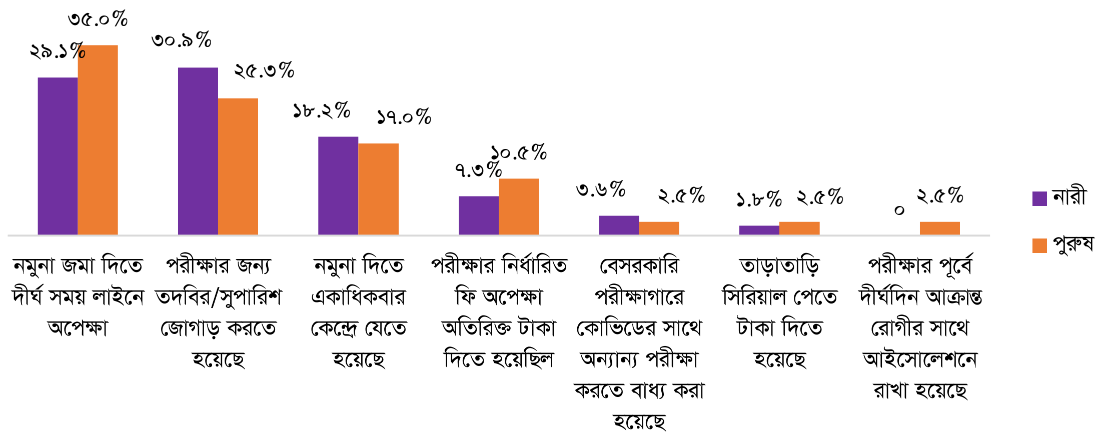

নমুনা পরীক্ষার ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতাদের হয়রানিসহ নানা ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতির মধ্যে নমুনা দিতে দীর্ঘ সময় লাইনে অপেক্ষা, পরীক্ষার জন্য তদবির বা সুপারিশ জোগাড় করা, নমুনা দিতে একাধিকবার কেন্দ্রে যাওয়া, নির্ধারিত ফি অপেক্ষা অতিরিক্ত টাকা দিতে বাধ্য হওয়া ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বেসরকারি পরীক্ষাগারগুলোর ক্ষেত্রে করোনাভাইরাস পরীক্ষার সাথে অন্যান্য পরীক্ষা করতে বাধ্য হয়েছে। নারীদের ক্ষেত্রে পরীক্ষার জন্য সুপারিশ/তদবির জোগাড়ের হার অধিকভাবে লক্ষ করা গেছে। বাকিগুলোর ক্ষেত্রে পুরুষরা অধিক অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার হয়েছে। সার্বিকভাবে শতকরা ১৫ শতাংশ সেবাগ্রহীতার ক্ষেত্রে নমুনা পরীক্ষায় নির্ধারিত ফি অপেক্ষা অতিরিক্ত টাকা আদায় করা হয়েছে। সরকারি পরীক্ষাগারের ক্ষেত্রে এই অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের পরিমাণ সর্বোচ্চ ৩,২০০ টাকা, এবং বেসরকারি পর্যায়ে সর্বোচ্চ ৭,৬৫০ টাকা। এবং নমুনা পরীক্ষায় দ্রুত সিরিয়াল পাওয়ার জন্য সার্বিকভাবে ৪.৫ শতাংশ সেবাগ্রহীতা গড়ে ৯৪৬ টাকা ঘুষ দিয়েছেন।

৩.৫.১ নমুনা পরীক্ষায় দুর্নীতি

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর অনুমোদিত একটি প্রতিষ্ঠান ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, নরসিংদীসহ দেশের বিভিন্ন এলাকার মাঠ পর্যায় থেকে নমুনা সংগ্রহ নমুনা সংগ্রহ করে কোনো পরীক্ষা না করেই ১৫ হাজার ৪৬০ জনকে করোনা পরীক্ষার ভুয়া রিপোর্ট সরবরাহ করেছে। এই প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তির শর্ত ছিল, বিভিন্ন স্থানে বুথ স্থাপন করা হবে এবং সেখান থেকে নমুনা সংগ্রহ করে সরকার নির্ধারিত করোনা শনাক্তকরণ ল্যাবরেটরিতে নমুনা পাঠাতে হবে। কিন্তু সংগৃহীত নমুনা ফেলে দিয়ে নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী আইইডিসিআরের প্যাডে ফল লিখে তা ইমেইল করে পাঠিয়ে দেওয়া হতো। পরীক্ষার জন্য জনপ্রতি নেওয়া হতো সর্বনিম্ন ৫,০০০ টাকা। বিদেশি নাগরিকদের কাছে জনপ্রতি এক শ ডলার। এই হিসাবে এই প্রতিষ্ঠান করোনার ভুয়া টেস্ট করে সাত কোটি ৭০ লাখ টাকা হাতিয়ে নেয়। একটি সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসক রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে এই অনুমোদন নেয়, এবং এ ধরনের কার্যক্রমে তাদের কোনো ধরনের অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে তাদের অনুমোদন দেওয়া হয়।[৩৫]

কোভিড-১৯ চিকিৎসার জন্য লাইসেন্সবিহীন হাসপাতালের সাথে সরকার করোনা চিকিৎসার চুক্তি করে। পরবর্তীতে উক্ত প্রতিষ্ঠান তিন হাজার ৯৩৯ জন ব্যক্তির নমুনা করোনাভাইরাস পরীক্ষার জন্য সংগ্রহ করে তা বিভিন্ন সরকারি পরীক্ষাগার থেকে বিনামূল্যে পরীক্ষা করিয়ে নিয়ে আসলেও নমুনা পরীক্ষার ফি হিসেবে প্রত্যেক ব্যক্তির কাছ থেকে ৩,৫০০ টাকা করে আদায় করে। এভাবে তারা এক কোটি ৩৭ লাখ ৮৬ হাজার টাকা হাতিয়ে নেয়। [৩৬]

একটি মেডিক্যাল কলেজ করোনা পরীক্ষার জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে অনুমোদন প্রাপ্ত হয়। কিন্তু করোনা পরীক্ষার জন্য যথাযথ মেশিন না থাকায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর উক্ত হাসপাতালে করোনা পরীক্ষার অনুমোদন বাতিল করে। কিন্তু তারা অবৈধভাবে অ্যান্টিবডি

[৩৫] দৈনিক কালেরকণ্ঠ, জেকেজির ডা. সাবরিনা গ্রেপ্তার, এখনো অধরা রিজেন্টের সাহেদ, ১৩ জুলাই, ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: https://www.kalerkantho.com/online/national/2020/07/13/934206

[৩৬] দৈনিক প্রথম আলো, প্রভাবশালীরা নেই, দুদকের মামলায় আসামি সাহেদসহ ৫ জন, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime

পরীক্ষা করে রোগীদের কাছ থেকে তিন থেকে ১০ হাজার টাকা করে আদায় করে। এছাড়া অন্য হাসপাতাল হতে পরীক্ষা করিয়ে নিজেদের প্যাডে রিপোর্ট দেওয়া হতো।[৩৭]

৩.৫.২ প্রবাসীদের পরীক্ষার ক্ষেত্রে হয়রানি

সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী ২৩ জুলাই হতে বাংলাদেশ থেকে বিদেশগামী যাত্রীদের জন্য কোভিড পরীক্ষার সনদ বাধ্যতামূলক করা হয়। নির্দেশনা অনুযায়ী ১৬টি সরকারি হাসপাতাল/ প্রতিষ্ঠানে কোভিড পরীক্ষা করাতে হবে। যাত্রার ৭২ ঘণ্টা বা তিন দিন আগের কোনো নমুনা সংগ্রহ করা হবে না এবং যাত্রার ২৪ ঘণ্টা পূর্বে প্রতিবেদন প্রদানের কথা উল্লেখ করা হয়।[৩৮] যদিও অনেক দেশেই এর বাধ্যবাধকতা ছিল না। বিদেশগামীদের করোনা পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ১৮ দিনের মাথায় পরিবর্তন করা হয়। কিন্তু বাধ্যতামূলক করার পর এই কয়েক দিনেই ব্যাপক সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়েছে বিদেশগামীদের। এই সময়ে বাংলাদেশ থেকে অনেকেই ভুয়া সনদ দেখিয়ে বিদেশ গিয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। যাতায়াত ও পরীক্ষা বাবদ বিদেশগামীদের অতিরিক্ত ১০-১৫ হাজার টাকা খরচ করতে হয়। সারাদেশে মোট ১৩টি জেলার সিভিল সার্জনের কার্যালয়ে ১৩টি বুথে বিদেশগামীদের নমুনা পরীক্ষার বুথ ছিল এবং ঢাকায় ছিল মাত্র একটি। ফলে ৪৮ ঘণ্টা আগে নমুনা দেওয়ার কথা থাকলেও সময়মত তা হাতে না পাওয়ায় যাত্রীদের অনেকেই ফ্লাইট ধরতে পারছিলেন না। পরীক্ষাগার থেকে যথা সময়ে প্রতিবেদন না পাওয়ায় অনেক প্রবাসীদের কর্মক্ষেত্রে ফেরার ক্ষেত্রে ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যায়, অনেক কষ্টে জোগাড় করা ফ্লাইট বাতিল হয়ে যায়। এছাড়া কয়েকটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ভুয়া প্রতিবেদন নিয়ে ভ্রমণ করায় ছয়-সাতটি দেশে বাংলাদেশীদের গমনের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ এবং যাত্রীদের ফেরত পাঠানো হয়। এবং অনেক দেশে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত সনদ গ্রহণ করেনি।

৩.৬ উপসংহার

এ অধ্যায়ে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশে প্রয়োজন অনুসারে যে পরিমাণ নমুনা পরীক্ষার দরকার ছিল এবং জাতীয় পরিকল্পনা অনুযায়ী নমুনা পরীক্ষার সুবিধা সম্প্রসারণ না করে শহরকেন্দ্রিক ও বেসরকারি পর্যায়ের বাণিজ্যিক সেবা বৃদ্ধি করা হয়েছে। সরকারি পরীক্ষাগারে ফি নির্ধারণ, বেসরকারি বানিজ্যিক পরীক্ষাগারের সংখ্যা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি এবং জেলা পর্যায়ে পরীক্ষাগার সম্প্রসারণ না করাটা কার্যত শহরকেন্দ্রিক স্বচ্ছল ব্যক্তিদের করোনা পরীক্ষায় প্রবেশগম্যতা বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং দরিদ্র, প্রান্তিক ও দুর্গম এলাকার জনগোষ্ঠীর জন্য সেবা সীমিত করার মাধ্যমে নমুনা পরীক্ষার ক্ষেত্রে তাদের নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। ফলে নমুনা পরীক্ষার এই সীমিত সুযোগ ও পরীক্ষাগারের সক্ষমতার ঘাটতি ও বেসরকারি পরীক্ষাগারের বাণিজ্যিক মনোভাব নমুনা পরীক্ষার ক্ষেত্রে জনগণের নানা ধরনের হয়রানি ও অনিয়ম দুর্নীতির শিকার হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি করা হচ্ছে। এসব প্রক্রিয়ার কারণে পরীক্ষা করাতে নানা ধরনের হয়রানির শিকার হওয়া এবং নমুনা পরীক্ষায় সংঘটিত অনিয়ম-দুর্নীতির কারণে পরীক্ষার ক্ষেত্রে মানুষ আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। যার ফলে জুলাই-আগস্ট মাসে উল্লেখযোগ্যভাবে নমুনা পরীক্ষার সংখ্যা এবং আক্রান্তের সংখ্যা হ্রাস পায় যাকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে রাজনৈতিক সাফল্য হিসেবে প্রচারের অভিযোগ রয়েছে।

[৩৭] দৈনিক কালেরকণ্ঠ, করোনা পরীক্ষার নামে প্রতারণা, রিজেন্টের পর শাহাবুদ্দিন মেডিক্যাল বন্ধ, ২০ জুলাই, ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: https://www.kalerkantho.com/online/national/2020/07/20/936952

[৩৮] দৈনিক প্রথম আলো, বিদেশ যেতে ১৬ প্রতিষ্ঠানের বাইরে করোনা পরীক্ষা নয়, সনদ বাধ্যতামূলক ২৩ জুলাই থেকে, ১৮ জুলাই ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: https://www.prothomalo.com/bangladesh/

চতুর্থ অধ্যায়

করোনা আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসা ব্যবস্থা

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুসারে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর মধ্যে ১৪ শতাংশের হাসপাতালে ভর্তি হওয়া এবং অক্সিজেন সহায়তার প্রয়োজন হয় এবং পাঁচ শতাংশ রোগীর নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাসের প্রয়োজন হয়।[৩৯] কিন্তু টিআইবি'র পূর্বের গবেষণায় দেখা যায় ১৫ জুন-পূর্ববর্তী সময়ে বাংলাদেশে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পরিকল্পনা প্রণয়নে বিলম্ব, পরিকল্পনা অনুসারে সংক্রমণ শুরুর পূর্বেই সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের হাসপাতালসমূহে ঘাটতি যাচাইপূর্বক যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণে বিলম্ব, করোনা আক্রান্তের চিকিৎসার জন্য নির্ধারিত হাসপাতালসমূহের সক্ষমতার ঘাটতি, এবং অনিয়ম-দুর্নীতির কারণে করোনা আক্রান্তের চিকিৎসাসহ সাধারণ চিকিৎসা সেবায় নানা ধরনের অব্যবস্থাপনার সৃষ্টি হয়েছে। যার ফলে জনগণের চিকিৎসা সেবা গ্রহণে নানা ধরনের দুর্ভোগ লক্ষ করা গেছে, যা বিপুল সংখ্যক মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

বাংলাদেশে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসা ব্যবস্থাকে গুরুত্ব দিয়ে বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ২,০০০ চিকিৎসক এবং ৫,০০০ নার্স নিয়োগ, চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা ও নিবিড় চিকিৎসাসেবা ইউনিট (আইসিইউ) ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন ছাড়াও আরও ২৭ ধরনের গাইডলাইন প্রণয়ন, বিভিন্ন এলাকায় করোনা চিকিৎসার জন্য সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল নির্ধারণ ইত্যাদি। এছাড়া জাতীয় পরিকল্পনা ও কৌশলের সপ্তম সংস্করণে কোভিড চিকিৎসার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার ভিত্তিক কিছু কার্যক্রম চিহ্নিত করা হয়। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে হাসপাতালগুলোতে কোভিড রোগী চিহ্নিত করতে স্ক্রিনিং ও ট্রায়াজ সিস্টেম চালু করা, কোভিড ও নন-কোভিড রোগীর চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে সক্ষমতার ঘাটতিসমূহ পর্যালোচনা করা এবং তা পূরণে ব্যবস্থা গ্রহণ, পর্যাপ্ত অক্সিজেন সরবরাহ নিশ্চিত করা, পর্যাপ্ত ওষুধ ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ, জটিল রোগী ব্যবস্থাপনা ও আইসিইউ পরিচালনার জন্য স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান, আইসিইউ সক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদি। তবে পরিকল্পনা অনুসরণ করে কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও এখনো কোভিড চিকিৎসা ব্যবস্থায় বিশেষত জেলা পর্যায়ে নানা ধরনের চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান।

৪.১ কোভিড চিকিৎসা ব্যবস্থার সক্ষমতা

সরকারি তথ্যমতে বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসা ব্যবস্থাপনার জন্য সারাদেশে আইসিইউ শয্যার সংখ্যা মাত্র ৫৫০টি, ভেন্টিলেটরের সংখ্যা ৪৮০। যা জটিল করোনা রোগীর চিকিৎসার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এই সুবিধার অধিকাংশ ঢাকা শহর কেন্দ্রিক।

সারণি ৭: বিভাগ ভিত্তিক কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা এবং বিদ্যমান চিকিৎসা সুবিধা

বিভাগ	জনসংখ্যা	কোভিড আক্রান্ত সংখ্যা[৪০]	মৃত্যু	মৃত্যু হার	শয্যা[৪১]	আইসিইউ	ভেন্টিলেটর	অক্সিজেন সিলিন্ডার
ঢাকা	৪২,৬০৭,০০০	২৬৫,৩১২	২,৯৬২	১.১২	৮,১৯৪	৩৭৪	৩০৩	৫,৭৩৭
ময়মনসিংহ	১৩,৪৫৭,০০০	৬,৬৭৬	১২১	১.৮১	৪৮০	১৭	১৭	২৬৪
চট্টগ্রাম	৩৪,৭৪৭,০০০	৫০,১৯২	১,১৮২	২.৩৫	২,৪৮৫	৬৯	৬৮	২,১৩৫
রাজশাহী	২১,৬০৭,০০০	২০,৮৩৩	৩৭০	১.৭৮	১,৩০৩	২৪	২৪	২,৪৩৪
রংপুর	১৮,৮৬৮,০০০	১২,৮০৭	২৬১	২.০৪	৭৫৭	২০	১৫	৩৯৮
খুলনা	১৮,২১৭,০০০	২২,৫৮৬	৪৬৯	২.০৮	৭৫৫	১৮	১৮	২৬৪
বরিশাল	৯,৭১৩,০০০	৮,৮০৩	২০৪	২.৩২	৪৪৩	১২	২৬	৯১০
সিলেট	১২,৪৬৩,০০০	১৩,০৪২	২৪২	১.৮৬	৪২৬	১৬	৯	৫৯১
মোট	১৭১,৬৭৯,০০০	৪০০,২৫১	৫,৮১৮	১.৪৫	১৪,৮৪৩	৫৫০	৪৮০	১২,৭৩৩
ঢাকা নগর	-	-	-	-	৬,৬২৫	৩১০	২৬১	৪,০১৩
চট্টগ্রাম	-	-	-	-	৭৮২	৩৯	৪৪	৬১৬

[৩৯] WHO, Clinical Care for Severe Acute Respiratory Infection, WHO/2019-nCoV/SARI_toolkit/2020.1WHO/2019-nCoV/SARI_toolkit/2020.1

[৪০] World Health Organization (WHO), Bangladesh, More details: 26 October 2020 Morbidity and Mortality Weekly Update (MMWU) No35, https://www.who.int/bangladesh/emergencies/coronavirus-disease-(covid-19)-update/

[৪১] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, কোভিড-১৯ ডেডিকেটেড হাসপাতালসমূহের তথ্যাদি প্রেরণ, ৩১ আগস্ট, ২০২০, স্মারক নং-৪৫.০০.০০০০.১৬০.৯৯.০০২.২০ (অংশ-৫)-৭৪০

নগর									

মোট ৫৫০টি আইসিইউ শয্যার মধ্যে ৩৭৪টি ঢাকা বিভাগের (৬৮%) যার মধ্যে আবার ৩১০টি ঢাকা শহরের মধ্যে অবস্থিত। বাকি বিভাগগুলোর মৃত্যু হার ঢাকা বিভাগের চেয়ে বেশি হলেও চিকিৎসা ব্যবস্থা এখানে জোরদার করা হয় নি। বিশেষকরে মোট জনসংখ্যার অনুপাতে এই সংখ্যা খুবই কম।

৪.২ করোনা আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসা সেবা সম্প্রসারণ: সাড়া প্রদানে ঘাটতি

জাতীয় পরিকল্পনা ও কৌশলে জটিল রোগী ব্যবস্থাপনা ও আইসিইউ পরিচালনার জন্য স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং আইসিইউ সক্ষমতা বৃদ্ধির কথা বলা হলেও এই সেবা এখন পর্যন্ত শহর-কেন্দ্রিক অবস্থায় রয়েছে। এখন পর্যন্ত অধিকাংশ জেলা শহরে বা জেলা পর্যায়ে জটিল কোভিড চিকিৎসা সেবা অপ্রতুল/অনুপস্থিত। সারাদেশে ৫৫০টি আইসিইউ শয্যার মধ্যে ঢাকা শহরে ৩১০টি (৫৬%) এবং চট্টগ্রামে ৩৯টি (৭%) আইসিইউ শয্যা রয়েছে, বাকি ৬২টি জেলা ও বিভাগীয় শহরের জন্য বরাদ্দ মাত্র ২০১টি (৩৭%)। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবিলা করতে নতুন করে বিভিন্ন কার্যক্রম শুরু করছে। অথচ বাংলাদেশে কোভিডের জন্য নির্ধারিত কয়েকটি হাসপাতালে রোগী না থাকার কারণে চিকিৎসা কার্যক্রম বাতিল করে সাধারণ চিকিৎসা চালুর জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়।[৪২] এই নির্দেশনা জারির এক সপ্তাহ পরে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে কোভিড-১৯ এর দ্বিতীয় মোকাবিলার ক্ষেত্রে সক্ষমতা পর্যালোচনার জন্য সভা করা হয়। এর পূর্বে ৮ সেপ্টেম্বর একই কারণে বেসরকারি হলি ফ্যামিলি হাসপতালের সাথে কোভিড চিকিৎসা বিষয়ক চুক্তি বাতিল করা হয়।[৪৩] এছাড়া কোভিড মোকাবিলায় জনবলের ঘাটতি মোকাবিলায় চিকিৎসক ও নার্স নিয়োগ করা হলেও বিভিন্ন হাসপাতালে জনবল সংকট লক্ষ করা যায়। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত শতভাগ হাসপাতালে চিকিৎসক এবং ৮৯.১ শতাংশ হাসপাতালে নার্সের পদ শূন্য থাকলেও গত তিনমাসে ৫৬.৮ শতাংশ হাসপাতালে চিকিৎসক এবং ৪৮.৫ শতাংশ হাসপাতালে এখন পর্যন্ত নার্স নিয়োগ দেওয়া হয় নি।

৪.৩ জেলা পর্যায়ে চিকিৎসা সেবায় সক্ষমতার ঘাটতি

১৫ জুন ২০২ সাল পরবর্তী সময়ে আইসিইউ ও ভেন্টিলেটরের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হলেও বিভিন্ন এলাকার জনসংখ্যার অনুপাতে যথেষ্ট নয়। জটিল করোনা রোগীর চিকিৎসায় প্রয়োজনীয় আইসিইউ, ভেন্টিলেটর সেবা জেলা পর্যায়ে সম্প্রসারণ না করে ঢাকা শহরভিত্তিক সেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে (সারণি ৭) যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য বিভাগীয় এলাকায় জনসংখ্যা অনুপাতে আইসিইউ ও ভেন্টিলেটর সংকট এখনো বিদ্যমান। বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের প্রকৃত তথ্য-উপাত্তের ঘাটতি রয়েছে। ফলে কোন বিভাগে আক্রান্তের সংখ্যা কেমন এবং এক্ষেত্রে কী পরিমাণ আইসিইউ শয্যা বা ভেন্টিলেটর সুবিধার প্রয়োজন তা কখনোই সঠিকভাবে অনুধাবন করা সম্ভব হয় নি। তবে জনসংখ্যা অনুপাতে দেখা যায় যে, খুলনা ও রংপুর বিভাগে জটিল রোগীর চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় সকল সুবিধার দিকে থেকে পিছিয়ে আছে।

সারণি ৮: বিভিন্ন বিভাগে জনসংখ্যার অনুপাতে কোভিড চিকিৎসা সুবিধা

বিভাগ	জনসংখ্যা অনুপাতে চিকিৎসা সেবা (প্রতি লাখে)			
	শয্যা	আইসিইউ	ভেন্টিলেটর	অক্সিজেন
ঢাকা নগর	৩১.৫৪	১.৪৮	১.২৪	১৯.১০
ঢাকা	১৯.২৩	০.৮৮	০.৭১	১৩.৪৬
ময়মনসিংহ	৩.৫৭	০.১৩	০.১৩	১.৯৬
চট্টগ্রাম নগর	১৫.৫৮	০.৭৮	০.৮৮	১২.২৭
চট্টগ্রাম	৭.১৫	০.২০	০.২০	৬.১৪
রাজশাহী	৬.০৩	০.১১	০.১১	১১.২৬
রংপুর	৪.০১	০.১১	০.০৮	২.১১
খুলনা	৪.১৪	০.১০	০.১০	১.৪৫
বরিশাল	৪.৫৬	০.১২	০.২৭	৯.৩৭
সিলেট	৩.৪২	০.১৩	০.০৭	৪.৭৪
মোট	৮.৬৫	০.৩২	০.২৮	৭.৪২

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে বিভিন্ন সময় দাবি করা হয় যে, দেশে কোভিড চিকিৎসার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই, সকল ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এমনকি বাংলাদেশের চিকিৎসা ব্যবস্থার সাথে ইউরোপ আমেরিকার দেশসমূহের চিকিৎসা সেবা সাথে তুলনা করা[৪৪] হলেও এখনো বাংলাদেশের জেলা পর্যায়ের চিকিৎসা ব্যবস্থায় সক্ষমতার ঘাটতি লক্ষণীয়।

[৪২] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, কোভিড-১৯ ডেডিকেটেড হাসপাতালের কার্যক্রম বাতিলপূর্বক সাধারণ রোগী সেবা পরিচালনা, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২০, স্মারক নং-৪৫.০০.০০০০.১৬০.৯৯.০০২.২০ (অংশ-১)-৭৮৩

[৪৩] দৈনিক বাংলা ট্রিবিউন, কোভিড হাসপাতালের তালিকা থেকে হলি ফ্যামিলি বাদ, ৯ সেপ্টেম্বর ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: https://www.banglatribune.com/others/news/641468/

[৪৪] বিডি নিউজ ২৪.কম, ট্রাম্পের মতোই চিকিৎসা পাচ্ছে বাংলাদেশের মানুষ: স্বাস্থ্যমন্ত্রী, ৯ অক্টোবর, ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: https://bangla.bdnews24.com/bangladesh/article1813352.bdnews

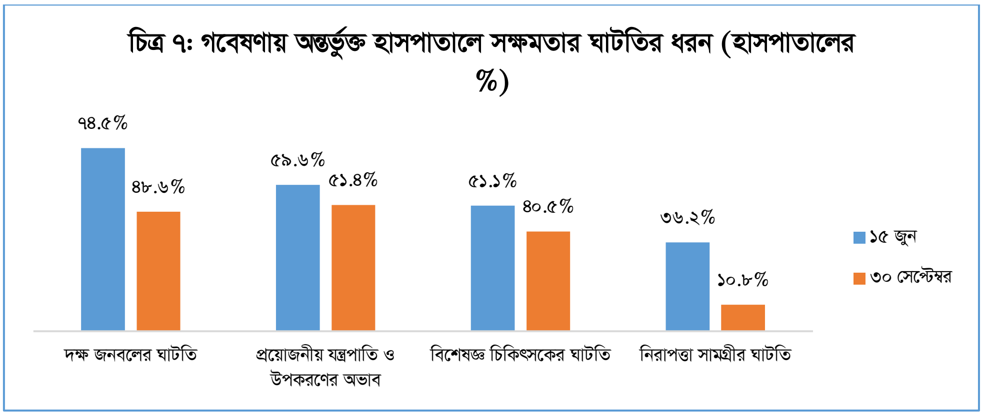

চিত্র ৭-এ লক্ষ করা যায় যে ১৫ জুন পরবর্তী সময়ে জেলা পর্যায়ের হাসপাতালগুলোর সক্ষমতার ক্ষেত্রে কিছু অগ্রগতি হলেও এখনো ব্যাপক ঘাটতি বিদ্যমান। এখনো জেলা পর্যায়ের হাসপাতালগুলোতে দক্ষ জনবল, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি এবং নিরাপত্তা সামগ্রীর ঘাটতি রয়েছে।

৪.৩.১ চিকিৎসা সেবায় সক্ষমতার ঘাটতি: কোভিড স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে সেবাগ্রহীতাদের সমস্যা বা হয়রানি

কোভিড চিকিৎসা ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতার ঘাটতি বিদ্যমান থাকার কারণে সেবাগ্রহীতারা কোভিড চিকিৎসা সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখিন হচ্ছে বা হয়রানির শিকার হচ্ছে যা এই গবেষণায় পরিচালিত চরিপে উঠে আসে। স্বাস্থ্য সেবাগ্রহীতাদের ৩৭.৪ শতাংশ সেবা গ্রহণে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। এই সমস্যা বা হয়রানি হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার সময় থেকে শুরু হয়। ভর্তি হওয়ার সময় সেবাগ্রহীতারা বিভিন্ন হাসপাতালের কর্মচারীর বাজে আচরণের শিকার হয়, স্ট্রেচার বা হুইল চেয়ার পাওয়ার ক্ষেত্রে অসহযোগিতা করা হয়, ভর্তিও জন্য একাধিক হাসপাতালে যেতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে এই ধরনের হয়রানি বা সমস্যার কারণে অনেক সেবাগ্রহীতার মৃত্যু হয়েছে (৮.৭%)।

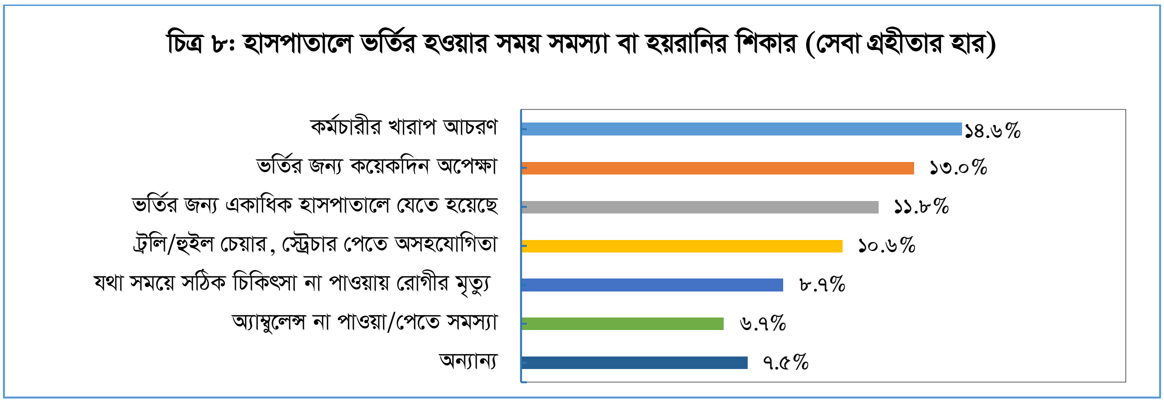

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে নিয়মিতভাবে প্রকাশ করা হয় যে সারা দেশে শয্যা ও আইসিইউ এর কোনো সংকট নেই। রোগী না থাকায় এসব শয্যা খালি পড়ে থাকে।[৪৫] রোগী না থাকার কারণে কয়েকটি কোভিড ডেডিকেটেড হাসপাতাল বন্ধ করা হলেও জরিপে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া সেবাগ্রহীতাদের একাংশ আইসিইউ ও ভেন্টিলেটরের সংকট থাকার কারণে এই সেবা থেকে বঞ্চিত হয়।

[৪৫] স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, কোভিড-১৯ সংক্রান্ত পরিস্থিতি, প্রতিদিনকার সংবাদ বিজ্ঞপ্তি উল্লেখ

চিত্র ৯: হাসপাতালে প্রয়োজনের সময় সেবা প্রাপ্তির হার (সেবাগ্রহীতার %)

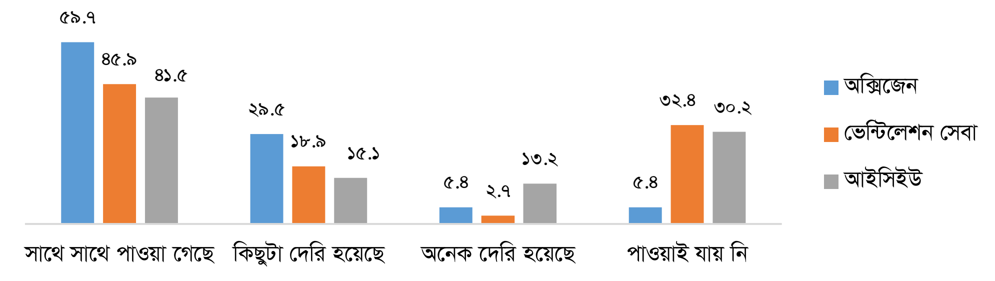

চিত্র ৯ এ দেখা যায় প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও ৫.৪, ৩২.৪ এবং ৩০.২ শতাংশ সেবাগ্রহীতা যথাক্রমে অক্সিজেন সরবরাহ, ভেন্টিলেশন সেবা বা আইসিইউ শয্যা পায় নি। এছাড়া সেবাগ্রহীতাদের ৩.১ শতাংশই কখনোই চিকিৎসক বা নার্সের সেবা পান নি এবং ৩৪.৩ শতাংশ ও ৪৮.৭ শতাংশ সেবাগ্রহীতা মাঝে মাঝে বা দিনে একবার করে নার্স ও চিকিৎসকের সেবা পেয়েছেন।

চিত্র ১০: হাসপাতালে চিকিৎসক ও নার্সের সেবা প্রাপ্তির হার (সেবাগ্রহীতার %)

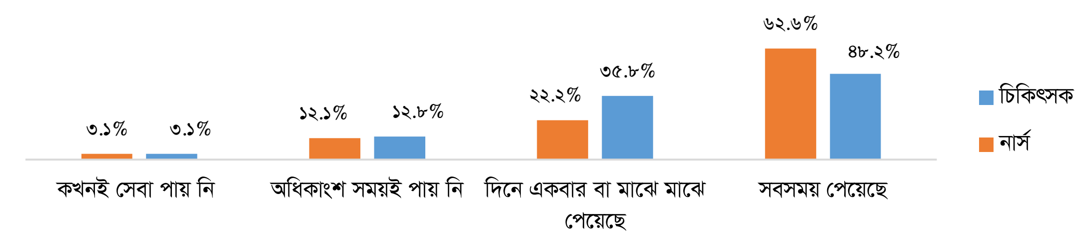

৪.৪ চিকিৎসা ব্যবস্থায় অনিয়ম-দুর্নীতি

করোনা আক্রান্তের চিকিৎসা ব্যবস্থায় সক্ষমতার ঘাটতি ও বিভিন্ন ধরনের সমস্যার পাশাপাশি অনিয়ম-দুর্নীতিও বিদ্যমান রয়েছে। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত হাসপাতালসমূহের ৩৫.১ শতাংশে বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতি সংঘটিত হয়। কয়েকটি ক্ষেত্রে ১৫ জুন পরবর্তী সময়ে ইতিবাচক অগ্রগতি হলেও স্বাস্থ্যকর্মীদের দায়িত্ব পালনে অবহেলা ও অনুপস্থিতি পূর্বের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে।

চিত্র ১১: হাসপাতালসমূহে চিকিৎসা ব্যবস্থায় অনিয়ম-দুর্নীতি (হাসপাতালের %)

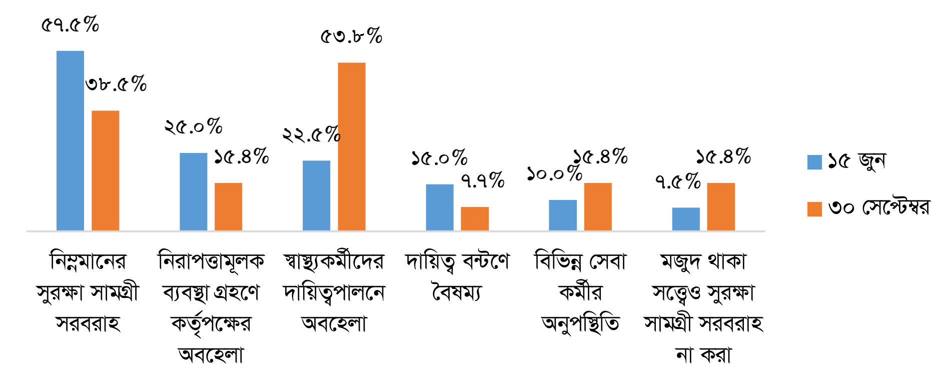

৪.৫ উপসংহার

বাংলাদেশে করোনার চিকিৎসা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বর্তমানে কোনো ধরনের সংকট নেই এমন দাবি করা হলেও এখনো জেলা পর্যায়ের হাসপাতালে বিভিন্ন সক্ষমতার ঘাটতি লক্ষ করা গেছে। যথাযথ পর্যালোচনার মাধ্যমে এই সক্ষমতার ঘাটতি উৎঘাটন এবং তা পূরণে বিশেষত জেলা পর্যায়ে চিকিৎসা সেবা সম্প্রসারণে যথাযথ উদ্যোগের ঘাটতি রয়েছে। সক্ষমতার ক্ষেত্রে পূর্বের চেয়ে কিছু অগ্রগতি হলেও এখণও সেবাগ্রহীতারা বিভিন্ন সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে হয়রানি ও অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার হচ্ছেন।

পঞ্চম অধ্যায়

সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ

একটি স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে সংক্রমণ হতে রোগীর ও স্বাস্থকর্মীর নিরাপত্তা, সেবা কেন্দ্রের পরিবেশের সুরক্ষা এবং এই সংক্রামক রোগের ঝুঁকি থেকে কমিউনিটিকে সুরক্ষা করতে উক্ত প্রতিষ্ঠানে সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ (আইপিসি) খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব শুরুর পর থেকে সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে সরকারের পক্ষ থেকে কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়, যার মধ্যে কোভিড-১৯ সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ গাইডলাইন, করোনা আক্রান্ত মৃতদেহ সৎকারের স্ট্যান্ডার্ড অপারেশনাল প্রসিডিউর, ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী ব্যবহার বিধি, পরিচ্ছন্নতা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন প্রণয়ন, মে মাসের মধ্যে ২৪০টি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের ২,২০০ চিকিৎসক, নার্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের এ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ট্রায়াজ ও স্ক্রিনিং ব্যবস্থার মাধ্যমে দ্রুততার সাথে কোভিড রোগী চিহ্নিত করার গাইডলাইনও প্রণয়ন করা হয়।[৪৬] জাতীয় পরিকল্পনায় সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বেশ কিছু কৌশল নির্ধারণ করা হয়, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে পর্যাপ্ত সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহ, স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের এ বিষয়ক সক্ষমতা বৃদ্ধি, সকল স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ট্রায়াজ ব্যবস্থার প্রচলন, গাইডলাইন অনুযায়ী হাত ধোয়া, পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা, পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা, স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে পরিবেশ-বান্ধব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা ইত্যাদি। এছাড়া বাংলাদেশে হাসপাতালসমূহের চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য 'চিকিৎসা বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮' রয়েছে, যেখানে সংক্রামক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু জাতীয় পরিকল্পনার কৌশল ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন বা বর্জ্য বিধি অনুসরণ করে সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে এখনো সারাদেশের হাসপাতালসমূহে চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান।

৫.১ সংক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থায় সক্ষমতার ঘাটতি

করোনা চিকিৎসায় নির্ধারিত হাসপাতালগুলোতে বর্জ্য শোধনে আধুনিক ব্যবস্থা নেই। চিকিৎসা বর্জ্য পৃথক করা বা নিরাপদে ধ্বংস করার যথাযথ নিয়মগুলো মানা হচ্ছে না। অনেক হাসপাতালে মাটিতে পুঁতে ফেলা বা পোড়ানো হলেও যথাযথভাবে বিধি অনুসরণ না করায় পরিবেশ দূষণের ঝুঁকি থাকছে। অধিকাংশ হাসপাতালে চিকিৎসা বর্জ্য 'বায়োহ্যাজার্ড' ব্যাগে না ভরে ড্রামে বা উন্মুক্ত অবস্থায় খোলা ডাস্টবিনে ফেলে রাখা হচ্ছে।[৪৭] দেশে করোনাভাইরাস সংক্রমণ শুরুর পর শুধু ঢাকাতেই প্রতিদিন গড়ে ২০৬ টনের বেশি করোনা বর্জ্য উৎপাদিত হচ্ছে।[৪৮] কোভিড-১৯ মোকাবেলায় বিশেষভাবে ব্যবহৃত সামগ্রী ধ্বংস না করায় এগুলো নতুনভাবে সংক্রমণের ঝুঁকি তৈরি করছে।[৪৯]

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিষয়ক ব্রিটিশ একাডেমিক জার্নাল *ল্যানসেট* এবং বাংলাদেশের মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় যুক্ত একমাত্র বেসরকারি সংস্থা প্রিজম বাংলাদেশ ফাউন্ডেশনের তথ্যমতে, দেশের ১৪ হাজার ৭৭০টি সরকারি-বেসরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মাত্র এক হাজার ৪৫৮টি প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য সঠিক নিয়মে ধ্বংস করা হয়। দেশের ৯০ ভাগের বেশি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য মিশে যাচ্ছে সাধারণ বর্জ্যের সাথে, এর সাথে চলমান করোনাভাইরাস চিকিৎসা সংক্রান্ত বর্জ্য মিশে স্বাস্থ্য ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলছে কয়েক লাখ পরিচ্ছন্নতা কর্মীর।[৫০] সারাদেশে হাসপাতালসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ৩৮ জন পরিচ্ছন্নতা কর্মী কোভিডে আক্রান্ত হয়েছে এবং মারা গেছে চারজন। এছাড়া পেশাদার পরিচ্ছন্নতা কর্মীর বাইরে বর্জ্য থেকে বিভিন্ন জিনিস কুড়িয়ে বিক্রি করার পেশায় প্রায় ৪০ হাজার পথ শিশু ('টোকাই') মারাত্মক ঝুঁকিতে রয়েছে।[৫১] সরকারি হাসপাতালগুলোতে অল্প সংখ্যক পরিচ্ছন্নতা কর্মীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হলেও অধিকাংশ বেসরকারি হাসপাতালে এমন উদ্যোগ নেই।[৫২]

৫.২ হাসপাতালের সংক্রমণ প্রতিরোধে মানসম্মত সুরক্ষা সামগ্রীর ঘাটতি

প্রথম পর্বের গবেষণায় করোনা চিকিৎসা সেবায় জেলা পর্যায়ের হাসপাতালগুলোতে স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য প্রয়োজনীয় সুরক্ষা সামগ্রীর ঘাটতির ক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়েছে। অধিকাংশ হাসপাতালে সরক্ষা সামগ্রীর পর্যাপ্ত মজুদ আছে। তবে অধিকাংশ হাসপাতালের স্বাস্থ্যকর্মীদের বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশিত মান অনুযায়ী সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহ করা হচ্ছে না (চিত্র ১৪)। অনেক হাসপাতালে শুধু কোভিড ইউনিটে সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহ করা হয়। আবার কোথাও পিপিই'র আংশিক সরবরাহ করা হয় ও অনিয়মিতভাবে সরবরাহ করা হয়।

---

[৪৬] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ, 'বাংলাদেশে কোভিড-১৯ এর জন্য প্রস্তুতি ও সাড়াদান পরিকল্পনা', জুলাই ২০২০

[৪৭] ভোরের কাগজ, করোনার বর্জ্যে কী হবে,২৬ আগস্ট ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: https://www.bhorerkagoj.com/2020/08/26/

[48] বিস্তারিত, https://www.benarnews.org/bengali/news/coronavirus-08202020165314.html

[49] দৈনিক যুগান্তর, ব্যবহৃত করোনা সামগ্রী ঝুঁকিপূর্ণ, নেই পরিশোধনের ব্যবস্থা, বিস্তারিত দেখুন: https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/317612/,

[50] বিস্তারিত, https://www.benarnews.org/bengali/news/coronavirus-08202020165314.html, 20 August 2020

[51] বিস্তারিত, https://www.bhorerkagoj.com/2020/08/26/

[52] বিস্তারিত, https://www.bhorerkagoj.com/2020/08/26/

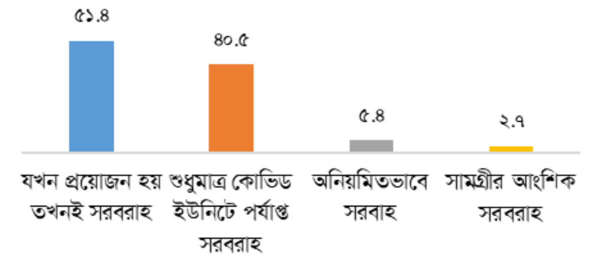

চিত্র ১২: হাসপাতালের চিকিৎসকদের নিরাপত্তা সামগ্রী সরবরাহ (হাসপাতালের %)

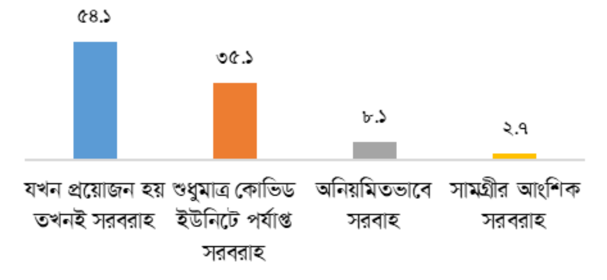

চিত্র ১৩: হাসপাতালের নার্সদের নিরাপত্তা সামগ্রী সরবরাহ (হাসপাতালের %)

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত হাসপাতালের ৪৮.৬ শতাংশে এন ৯৫/কেএন ৯৫/এফএফপি২ মাস্ক সরবরাহ করা হয় না, শুধু সাধারণ সার্জিক্যাল মাস্ক সরবরাহ করা হয়। অনেক হাসপাতালে স্বাস্থ্যকর্মীগণ নিজ উদ্যোগে মাস্ক কিনে নেন।

চিত্র ১৪: বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার গাইডলাইন অনুযায়ী সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহ (হাসপাতালের %)

৫.৩ সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহে অনিয়ম-দুর্নীতি: মানহীন সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহ

বিদেশী অর্থায়নে পরিচালিত একটি প্রকল্পে অনিয়ম-দুর্নীতির মাধ্যমে মানহীন সুরক্ষা সামগ্রী ক্রয় করে জেলা পর্যায়ের হাসপাতালগুলোতে পাঠানো হয়। চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের ঝুঁকি বিবেচনায় চতুর্থ ধাপের পিপিই ক্রয়ের কথা থাকলেও প্রকল্প পরিচালকের একক সিদ্ধান্তে চিকিৎসকদের জন্য প্রথম ধাপের এক লাখের বেশি পিপিই ক্রয় করা হয়। এসব সুরক্ষা সামগ্রীর মান নিশ্চিত নয় বলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর তাদের গুদামে মাল উঠাতে দেয় নি। অভিযোগ রয়েছে, প্রকল্পের পরিচালক ৬৩ জেলায় ১ হাজারটি করে এই পিপিই পাঠিয়ে দিয়েছেন।

৫.৪ বিপুল সংখ্যক চিকিৎসকের করোনায় আক্রান্ত হওয়া ও মৃত্যুবরণ

বাংলাদেশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (বিএমএ) এর তথ্যমতে করোনা সংক্রমণের শুরু থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ২,৮৫৩ জন চিকিৎসক করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হন। কোভিড-১৯ ও করোনার উপসর্গে ১০১ জন চিকিৎসক প্রাণ হারিয়েছেন। এছাড়া বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের (বিএমএ) এবং সোসাইটি ফর নার্সেস সেফটি অ্যান্ড রাইটসের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ২২ অক্টোবর ২০২০ পর্যন্ত সারা দেশে সাত হাজার ২৪৯ জন চিকিৎসক, নার্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। ১০ জন নার্স মারা গেছেন।[৫৩]করোনা শুরুর দিকে মৃত্যু বেশি ছিল। বর্তমানে মৃত্যুর সংখ্যা কম হলেও এখনো অব্যাহত রয়েছে। শুরু থেকে হাসপাতালগুলোর অব্যবস্থাপনা, সুরক্ষা সামগ্রীর ঘাটতি এবং নিম্নমানের সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহ এত চিকিৎসকের মৃত্যুর অন্যতম একটি কারণ।

[৫৩] দৈনিক যুগান্তর, ঝুলে আছে ১ শ' কোটি টাকা, ২২ অক্টোবর ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/357291/

সারণি ৯: করোনা ভাইরাসে চিকিৎসকের আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা

মাস	চিকিৎসকের মৃত্যু সংখ্যা[৫৪]	আক্রান্তের সংখ্যা[৫৫]
এপ্রিল	১	৩৯২
মে	১৩	
জুন	৪৫	৮৪২
জুলাই	১৫	৮৯৫
আগস্ট	১২	৫৫৯
সেপ্টেম্বর	৮	১৩৮
অক্টোবর	৭	২৭
মোট	১০১	২৮৫৩

৫.৫ উপসংহার

দেশের জেলা পর্যায়ের হাসপাতালগুলোতে সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কিছুটা অগ্রগতি লক্ষ করা গেলেও এখনো চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য প্রয়োজনীয় সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহ পূর্বের চেয়ে বৃদ্ধি পেলেও এখনো জেলা পর্যায়ের বেশ কিছু হাসপাতালে সংকট রয়েছে। একইভাবে জেলা পর্যায়ের হাসপাতালে মানসম্মত সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহও পূর্বের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে সরকারি ক্রয়ে দুর্নীতি চলমান থাকায় এখনো মানহীন সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহ অব্যাহত রয়েছে যা বিপুল সংখ্যক চিকিৎসকের আক্রান্ত হওয়া এবং মৃত্যুর কারণ। এছাড়া সারা বাংলাদেশের অধিকাংশ চিকিৎসা কেন্দ্রেই এখনো মেডিক্যাল বর্জ্য, বিশেষত কোভিড বর্জ্যের কোনো সুষ্ঠু ব্যবস্থা না হওয়ায় স্বাস্থ্যকর্মী, সেবাগ্রহীতাসহ কমিউনিটির মানুষের স্বাস্থ্যঝুঁকি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

---

[৫৪] দৈনিক যুগান্তর, করোনা কেড়ে নিল ১০০ চিকিৎসক, ৩১ অক্টোবর ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: http://m.banglatribune.com/api/api_single_page_template?content_id=650420

[৫৫] দৈনিক প্রথম আলো, দায়িত্বের কাছে জীবন তুচ্ছ, ৩০ অক্টোবর ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: https://www.prothomalo.com/bangladesh/coronavirus/

ষষ্ঠ অধ্যায়
কমিউনিটি পর্যায়ে সংক্রমণ প্রতিরোধ

কমিউনিটিতে করোনা সংক্রমণ বিস্তার রোধের অন্যতম উপায় হচ্ছে আক্রান্ত ব্যক্তি বা আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে এসেছে এমন ব্যক্তি বা সংক্রমণের বাহককে চিহ্নিত করা (কনট্যাক্ট ট্রেসিং) এবং তাদের আইসোলেশ করা ও কোয়ারেন্টাইন করা। অনেকসময় সংক্রমণের বাহক নিজেও জানে না যে সে সংক্রমণ ছড়াচ্ছে। ফলে কমিউনিটি পর্যায়ে সংক্রমণ প্রতিরোধ করতে আক্রান্ত এলাকা হতে অন্য এলাকায় চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা এবং জনসমাগম নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন হয়। জাতীয় পরিকল্পনায় কমিউনিটি পর্যায়ে সংক্রমণ প্রতিরোধে বিভিন্ন কৌশল ও কার্যক্রম নেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ব্যাপক হারে মাস্ক পরিধান, আক্রান্ত ব্যক্তি ও তাদের পরিবারকে আইসোলেশনে রাখা, সন্দেভাজন সংক্রমণ বাহক এবং আক্রান্ত ব্যক্তির কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিত করা, এবং আইসোলেশন ও কোয়ারেন্টাইন কেন্দ্রের উন্নয়ন। এছাড়া বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ চলাচল নিয়ন্ত্রণ, বিদেশ হতে আগমনের পয়েন্টগুলোতে যাত্রীদের স্ক্রিনিং এবং আক্রান্ত ব্যক্তি ও সংক্রমণ বাহক চিহ্নিত করা, পরিবহনসহ সকল কিছু সংক্রমণ মুক্ত করা গুরুত্বপূর্ণ।

৬.১ কমিউনিটি পর্যায়ে সংক্রমণ বিস্তার রোধে গৃহীত পদক্ষেপসমূহে ঘাটতি

কমিউনিটি পর্যায়ে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য সামাজিক দূরত্ব মেনে চলা, ২৫ শতাংশ আসন খালি রেখে গণপরিহন চলাচলের নির্দেশ, করোনা ভাইরাস বিষয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সতর্কতামূলক নির্দেশনা বিষয়ে জনগণকে সচেতন করা ও তা পালনে প্রজ্ঞাপন জারি করা হলেও তা পালনে ঘাটতি লক্ষণীয়। সরকারের তরফে কঠোর উদ্যোগ গ্রহণে ঘাটতির কারণে সাধারণ জনগণ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে বাধ্য হচ্ছে না। ফলে হাটবাজার, গণপরিবহন, শপিংমলসহ জনসমাগমস্থলে স্বাস্থ্যবিধি উপেক্ষিত হচ্ছে। সরকারের পক্ষ থেকে কঠোর পদক্ষেপের ঘাটতির ফলে মাস্ক পরা ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখাসহ স্বাস্থ্যবিধি মানার বিষয়টি একেবারেই আমলে নেওয়া হচ্ছে না। স্বাস্থ্যবিধি না মেনেই অফিস, কলকারখানা, হাটবাজার, শপিংমলে যাচ্ছেন। একমাত্র আকাশপথে মাস্ক ব্যবহার হলেও অন্য গণপরিবহন যেমন বাস, ট্রেন, লঞ্চের যাত্রীদের অনেকে মাস্ক ব্যবহার করছেন না।

৬.২ সংক্রমণ প্রতিরোধে বিদেশ হতে আগমন নিয়ন্ত্রণে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

চীনের উহান শহরে করোনাভাইরাস সংক্রমণের ফলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক সতর্কতা জারির পর ২১ জানুয়ারি থেকে ঢাকার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে চীন থেকে আসা নাগরিকদের স্ক্রিনিং শুরু হয়। এর দুই সপ্তাহ পর ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে বাংলাদেশে যেকোনো পথে এবং প্রতিটি দেশ থেকে আসা সকল যাত্রীদের স্ক্রিনিংয়ের আওতায় আনা হয়। করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবের পর ২১ জানুয়ারি থেকে ২৩ অক্টোবর পর্যন্ত বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে বাংলাদেশে ১০,৭৯,৫৬৩ জনের আগমন ঘটে।[৫৬] স্বাস্থ্য অধিদফতরের তথ্যমতে, এদের মধ্যে নয় জনের মধ্যে করোনার উপসর্গ চিহ্নিত করা গেছে। এদের মধ্যে মাত্র একজনকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে, বাকিদের ছেড়ে দেওয়া হয়।[৫৭]

সারণি ১০: ২১ জানুয়ারি থেকে ২৩ অক্টোবর পর্যন্ত বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আগত যাত্রীর সংখ্যা

আগমনের এন্ট্রি পয়েন্ট	আগত যাত্রীর সংখ্যা (জন)
বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর	৬,৩৭,৯০৭
বিভিন্ন স্থলবন্দর	৩৮৯,৪০৭
চট্টগ্রাম ও মোংলা সমুদ্রবন্দর	৪৫,২২০
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট ও বেনাপোল রেলওয়ে স্টেশন	৭,০২৯
মোট আগত যাত্রীর সংখ্যা	**১০,৭৯,৫৬৩**

১৫ মার্চ হতে ইউরোপ ও অস্বাভাবিকভাবে আক্রান্ত দেশগুলো থেকে যাত্রীবাহী বিমান চলাচল বন্ধ ঘোষণা করা হয়। ইউরোপের মধ্যে শুধু যুক্তরাজ্য এ ঘোষণার আওতামুক্ত ছিল। এছাড়া পণ্যবাহী বিমান চলাচল অব্যাহত ছিল। একইসাথে বিশ্বের সব দেশের নাগরিকদের জন্য অন-অ্যারাইভাল ভিসা সুবিধা বন্ধ করা হয়। পরবর্তীতে ২১ মার্চ যুক্তরাজ্য, চীন, থাইল্যান্ড ও হংকং রুট ব্যতীত সকল রুটে বিমান বন্ধ করা হয়।[৫৮] সর্বশেষ ২৮ মার্চ হতে চীন ছাড়া সব আন্তর্জাতিক রুটে চলাচলকারী ফ্লাইট বন্ধ ঘোষণা করা হয়।[৫৯] স্বাস্থ্যবিধি ও বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) নীতিমালা অনুসরণ করে ১৬ জুন থেকে সীমিত

[৫৬] স্বাস্থ্য অধিদপ্তর: https://corona.gov.bd/storage/press-releases/October2020/

[৫৭] যুগান্তর, কোয়ারেন্টিন হচ্ছে না বিদেশ ফেরতদেও, ১৭ আগস্ট ২০২০, https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/335395

[৫৮] সমকাল, "রাত ১২টা থেকে ১০ দেশের সঙ্গে বিমান যোগাযোগ বন্ধ", https://samakal.com/bangladesh-others/article/200316119

[৫৯] প্রথম আলো, "চীন ছাড়া সব রুটে ফ্লাইট বন্ধ ৭ এপ্রিল পর্যন্ত ", https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1647509

পরিসরে ফের ফ্লাইট চালু হয়।[৬০] বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক) বাংলাদেশে ফ্লাইট পরিচালনাকারী এয়ারলাইন্সগুলোকে করোনা সংক্রমণ রোধে বিশেষ নীতিমালা ও স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করার নির্দেশনা প্রদান করে।

৬.৩ দেশের বিভিন্ন এন্ট্রি পয়েন্টে স্ক্রিনিং ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা

সরকার করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে বাংলাদেশের সকল বিমান, নৌ ও স্থলবন্দরে যাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষাসহ সকল ধরনের স্ক্রিনিং ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি করলেও স্ক্রিনিংয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বন্দরে করোনা আক্রান্ত শনাক্তে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির ঘাটতি বর্তমানেও বিদ্যমান। বিদেশ প্রত্যাগত মোট যাত্রীসংখ্যার প্রায় ৫০ শতাংশ প্রবেশ করে ঢাকার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের মাধ্যমে। অথচ শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রামের শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সিলেটের ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, বেনাপোল স্থলবন্দর ও চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরের সবকয়টি বন্দরেই হ্যান্ডহেল্ড স্ক্যানারের মাধ্যমে স্ক্রিনিংয়ের কাজ চলেছে। দেশের সকল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সমুদ্রবন্দর ও স্থলবন্দরে থার্মাল স্ক্যানার বা হ্যান্ড-হেল্ড স্ক্যানারের অভাব ও কার্যকর প্রয়োগের ঘাটতির কারণে এই স্ক্রিনিং ব্যবস্থা কার্যকর হয়নি। এসব স্ক্যানার দিয়ে যেহেতু শুধু যাত্রীদের শরীরের তাপমাত্রা পরীক্ষা করা হয়, সেহেতু উপসর্গহীন করোনা আক্রান্ত রোগীর এই পদ্ধতিতে চিহ্নিত করা সম্ভব হয় নি। ফলে সার্বিকভাবে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে দেশের বিভিন্ন এন্ট্রি পয়েন্টে গৃহীত পদক্ষেসমূহ কার্যকর হয় নি।

৬.৪ আইসোলেশন ও কোয়ারেন্টাইন ব্যবস্থায় সীমাবদ্ধতা

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিমান, নৌ ও স্থলপথ দিয়ে প্রতিদিন গড়ে দুই থেকে আড়াই হাজার যাত্রী প্রবেশ করলেও তাদের ভালোভাবে স্ক্রিনিং এবং প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিন না করার অভিযোগ রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, দেশের বিমানবন্দরগুলোয় জনস্বাস্থ্যের ভিত্তিতে ব্যবস্থা না নিয়ে কূটনৈতিক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। বিভিন্ন দেশ হতে ভ্রমণের ক্ষেত্রে এখন করোনাভাইরাস আক্রান্ত নয় এমন সনদ যাত্রীদের কাছে থাকার বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এই সনদ যাচাই না করেই বিদেশ হতে আসা যাত্রীদের ছেড়ে দেওয়া হয়। এই সনদ দেখাতে না পারলে তাদের ইন্সটিটিউশনাল কোয়ারেন্টিনে পাঠানোর নির্দেশ রয়েছে। তবে শুধু প্রবাসী শ্রমিকদের ক্ষেত্রেই এ নিয়ম অনুসরণ করা হয়। এক্ষেত্রে রাজধানীর আশকোনা ও দিয়াবাড়ীতে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনে পাঠানোর ব্যবস্থা রয়েছে। যাদের কোভিড-১৯ নেগেটিভ সনদ রয়েছে, তাদের হোম কোয়ারেন্টিনের জন্য ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। বিদেশ ফেরতদের দেশে প্রবেশের ক্ষেত্রে কোনো সুনির্দিষ্ট নীতিমালা নেই।

আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থার নিয়ম অনুসারে প্রতিটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র রাখার বিধান রয়েছে। যাত্রী, দায়িত্বরত বিভিন্ন সংস্থার কর্মীদের প্রাথমিক চিকিৎসা, বিমানবন্দরের স্যানিটেশন, ফিউমিগেশন ও আগত যাত্রীদের মধ্যে সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্তদের শনাক্ত করতে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে স্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে। তবে বিমানবন্দরে উপসর্গহীন করোনা আক্রান্ত যাত্রী শনাক্ত করার জন্য নমুনা পরীক্ষার কোনো ব্যবস্থা নেই।

৬.৫ সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতকরণে সীমাবদ্ধতা

দেশে সংক্রমণের ক্রমবর্ধমান অবস্থায় জাতীয় কারিগরি পরামর্শক কমিটি ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ ও চট্টগ্রামে কোরবানির পশুর হাট না বসানোর পরামর্শ দেয়। তবে রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে কোরবানির পশুর হাটের সংখ্যা হ্রাস করা হলেও তা একেবারে বন্ধ করা হয় নি, এবং পশুর হাটগুলোর কোথাও স্বাস্থ্যবিধি মানা হয় নি। পশুর হাট পরিচালনায় সামাজিক দূরত্ব মেনে চলার ক্ষেত্রে জনগণের সচেতনতা ও আইন প্রয়োগের যথেষ্ট ঘাটতি লক্ষ করা গেছে।

৬.৬ লকডাউন ব্যবস্থা: লাল, হলুদ ও সবুজের নির্দেশনা[৬১]

বাংলাদেশের প্রায় সব জেলাতেই সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়লেও ঢাকা শহরে এ হার সবচেয়ে বেশি। সংক্রমণটি ঢাকা শহর ও আশপাশের অঞ্চল এবং চট্টগ্রাম শহরে সবচেয়ে বেশি আঘাত হেনেছে। উচ্চ সংক্রমণ রয়েছে এমন জেলাগুলোর মধ্যে নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, কিশোরগঞ্জ ও নরসিংদী অন্যতম। সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন এলাকায় সংক্রমণ হার বিবেচনা করে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ (লাল), অপেক্ষাকৃত কম ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা হলুদ এবং ঝুঁকিপূর্ণ নয় এমন এলাকাগুলোকে সবুজ হিসেবে চিহ্নিত করে এলাকাভিত্তিক লকডাউনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ৯ জুন ২০২০ 'বাংলাদেশ রিস্ক জোন বেজড কোভিড-১৯ কন্টিমিনেট ইমপ্লেমেন্টেশন স্ট্রাটেজি/গাইড' চূড়ান্ত করা হয়। এতে উল্লেখ করা হয় ১৪ দিনের মধ্যে ঢাকা শহরের কোনো এলাকায় যদি ৬০ জনের অধিক করোনা রোগী শনাক্ত হয় তবে তা রেড জোন হিসেবে লকডাউন করা হবে। ঢাকার বাইরে যে কোনো জেলায় ১০ জন রোগী থাকলে তা রেড জোন হিসেবে চিহ্নিত হবে। এভাবে সারদেশকে তিনটি জোনের (লাল, হলুদ, সবুজ) আওতায় নিয়ে করোনা মহামারি নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা চূড়ান্ত করা হয়।

---

[৬০] বাংলা ট্রিবিউন,করোনা সংক্রমণ রোধে বিদেশফেরতদের যেসব স্বাস্থ্যবিধি মানতে হয়, https://www.banglatribune.com/others/news/636392/

[৬১] যুগান্তর, "লকডাউন হবে রাজধানীর ৪৯ এলাকা",https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page

৬.৬.১ উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা (রেড জোন): রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইন্সটিটিউটের (আইইডিসিআর) তথ্যমতে, আক্রান্তের সংখ্যা হিসেবে রাজধানীর ৪৯টি এলাকা রেড জোনের মধ্যে পড়ে। গাইডলাইন অনুযায়ী শহরের কোনো এলাকায় রেড জোন ঘোষণা হলে সেখান থেকে কেউ বাইরে যেতে পারবেন না। সব কাজ ঘরে বসেই করতে হবে। তবে গ্রাম এলাকায় কৃষি কাজ করতে পারবে। অসুস্থ হলেই শুধু হাসপাতালে যাওয়ার অনুমতি রয়েছে। জরুরি প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয়ের ব্যবস্থা থাকবে তবে সাইকেলসহ যে কোনো ধরনের যানবাহন ব্যবহার করা সম্পূর্ণ নিষেধ। এমনকি নৌ, রেল বা সড়ক যোগাযোগও বন্ধ থাকবে। শহরাঞ্চলে মুদি ও ওষুধের হোম ডেলিভারি দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে। গ্রামে নির্দিষ্ট সময় ধরে দোকান খোলা থাকবে। গ্রামে কাঁচাবাজার খোলা থাকলেও শহরে সেটি থাকবে না।

৬.৬.২ অপেক্ষাকৃত কম ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা (ইয়েলো জোন): ঢাকা সিটির ক্ষেত্রে বিগত ১৪ দিনে কোনো এলাকায় ৩ থেকে ৫৯ জন করোনা আক্রান্ত রোগী থাকলে তা হবে ইয়েলো জোন। তবে ঢাকার বাইরে প্রতি লাখে ৩ থেকে ৯ জন রোগী থাকলেই সেটি ইয়েলো জোন বলে বিবেচিত হবে। ইয়েলো জোনের ক্ষেত্রে ৫০ ভাগ লোকবল নিয়ে অফিস বা ফ্যাক্টরি চালানো যাবে। তবে জনাকীর্ণ ফ্যাক্টরির ক্ষেত্রে ৩৩ শতাংশ শ্রমিক নিয়ে কাজ করতে হবে। জরুরি চলাচলের ক্ষেত্রে একজন যাত্রী নিয়ে রিকশা, ভ্যান বা সিএনজি, ট্যাক্সি চলবে। নিজে অথবা আবাসিক ড্রাইভার থাকলে ব্যক্তিগত গাড়ি চালানো যাবে।

৬.৬.৩ ঝুঁকিপূর্ণ নয় এমন (গ্রিন জোন): কোনো এলাকায় ১৪ দিনের মধ্যে রোগী যদি ৩ জনের কম অথবা কোনো রোগী না থাকলে সেটি হবে গ্রিন জোন।

৬.৬.৪ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নির্দেশাবলী

১০ জুন 'স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন-২০১৮-এর প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সরকারের অনুমোদন ক্রমে দেশের বিভিন্ন এলাকায় কোভিড-১৯ রোগের সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে কিছু নির্দেশ জারি করে, যার মধ্যে রয়েছে কোভিড-১৯ রোগের ঝুঁকি বিবেচনায় দেশের যে কোনো ছোট বা বড় এলাকাকে লাল, হলুদ বা সবুজ জোন হিসেবে চিহ্নিত করে 'বাংলাদেশ রিস্ক জোন বেজড কোভিড-১৯ কন্টিমিনেট ইমপ্লিমেন্টশন স্ট্রাটেজি/গাইড' অনুসরণ করে জোন ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন করা। প্রাথমিকভাবে তিনটি জেলায় (গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ ও নরসিংদী) এবং ঢাকা উত্তর সিটির রাজাবাজার এবং দক্ষিণ সিটির ওয়ারীতে পরীক্ষামূলকভাবে জোনিং সিস্টেম বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু হবে। জোন সুনির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট এলাকার কোন অংশে কার্যকর হবে এবং এর পরিধি কী হবে তা প্রয়োজন অনুসারে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করবে। গাইডলাইন বা নির্দেশনা অনুযায়ী স্বাস্থ্য অধিদফতর একটি কেন্দ্রীয় কারিগরি গ্রুপ গঠন করবে। আইনের ৩০ ধারা অনুসারে সংশ্লিষ্ট জেলার সিভিল সার্জনের কাছে জোনিং ঘোষণার ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। যিনি স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সিভিল প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা ও সশস্ত্র বাহিনী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় জোনিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবেন। প্রতিটি এলাকায় জোনিং সিস্টেম প্রস্তাব বা পরিবর্তনের জন্য প্রতিটি সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভা, জেলা ও উপজেলায় স্থানীয় কমিটি থাকবে। বিদ্যমান কোভিড-১৯ প্রতিরোধ সংক্রান্ত কমিটিগুলো এ দায়িত্ব পালন করবে। কমিটি জোনিং সিস্টেমের হালনাগাদ সংজ্ঞা ও বাস্তবায়ন কৌশল অনুসারে অব্যাহত ভাবে স্থানীয় পরিস্থিতি পর্যালোচনা করবে এবং জোনিং সিস্টেম চালু করতে হলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মতামত চাইবে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কেন্দ্রীয় কারিগরি গ্রুপের মতামত সাপেক্ষে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেবে। এবং বাস্তবায়নাধীন জোন এলাকায় কর্মরত সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চলাচল/ ছুটি/ দায়িত্ব পালন বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/ প্রতিষ্ঠান নির্দেশনা জারি করবে।

৬.৬.৫ লক ডাউন (পূর্ব রাজাবাজার, ঢাকা): ২০২০ সালে ৯ জুন মধ্যরাত থেকে রাজধানীর পূর্ব রাজাবাজার এলাকায় ১৪ দিনের জন্য পরীক্ষামূলক লকডাউন করা হয়। তবে করোনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না আসায় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ২৩ জুন লকডাউনের মেয়াদ আরও সাতদিন বাড়ানোর ঘোষণা দেওয়া হয়। ফলে ৩০ জুন মধ্যরাতে শেষ হয় মোট ২১ দিনের লকডাউন।

৬.৬.৬ লক ডাউন (ওয়ারী, ঢাকা): ৪ জুলাই থেকে ২৫ জুলাই ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ৪১ নম্বর ওয়ার্ড রেড জোনের আওতায় আনা হয়। এ এলাকায় ২১ দিনের সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়। ফলে এলাকার সরকারি-বেসরকারি সব অফিস-কারখানা বন্ধ রাখা হয়। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী যারা এ এলাকায় বসবাস করেন, তারাও এ ছুটির আওতাভুক্ত ছিলেন। ওষুধের দোকান ব্যতীত দোকান-পাট, বিপণি বিতান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানও বন্ধ রাখা হয়।

৬.৬.৭ জোন ভিত্তিক লকডাউন বিষয়ক পরিকল্পনা ও সমন্বয়ের ঘাটতি: লকডাউন কার্যকর করতে বিশেষজ্ঞ কর্তৃক ১২টি কার্যক্রম (জনসম্পৃক্ততা, শনাক্ত ব্যক্তির আইসোলোসেন, শতভাগ মাস্ক নিশ্চিত করা, সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করা করা, স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ ইত্যাদি) পরিচালনার সুপারিশ করা হলেও তা বাস্তবায়নে ঘাটতি লক্ষ করা যায়। সংক্রমণভিত্তিক এলাকা বিভাজন (রেড, ইয়োলো এবং গ্রিন জোন) ও রেড জোনে লকডাউন বাস্তবায়নের পরিকল্পনা কার্যকর হয় নি। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে জোনভিত্তিক লকডাউন কার্যকর করার ক্ষেত্রে এলাকাভিত্তিক পর্যাপ্ত তথ্যের ঘাটতি ছিল। তবে কৌশলপত্রের বাস্তবায়নে বিভিন্ন অংশীজনের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্য পাওয়া গেছে। ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের মেয়র বলেন, 'আমরা পূর্ব রাজাবাজার থেকে কাজ শুরু করব। লকডাউনের জন্য বিস্তারিত পরিকল্পনা করেছি।' ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন, 'আমরা সরকারের কোনো

সিদ্ধান্ত এখনো পাইনি।' এসকল বক্তব্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মধ্যে সমন্বয়হীনতাকে নির্দেশ করে। লকডাউন সফল করতে কৌশলপত্রে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিশেষ ভূমিকার উল্লেখ থকালেও তাদের উল্লেখযোগ্য সম্পৃক্ততা দেখা যায় নি। তবে তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয় লকডাউনের ব্যাপারে তাদের কোনো নির্দেশনা দেওয়া হয় নি। এছাড়া বিশেষজ্ঞ কমিটির একজন সদস্যের মতে জনগণের সম্পৃক্ততার ঘাটতি ছিল। এ সকল সমন্বয়হীনতার কারণে লকডাউন কার্যকর করা সম্ভব হয় নি।

৬.৬.৮ সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা: করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা ও স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি ও আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে ঘাটতি লক্ষণীয় ছিল। ২৫ শতাংশ আসন খালি রেখে গণপরিবহন চলাচলের নির্দেশনা থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা মানতে দেখা যায় নি। পশুর হাট, গার্মেন্টস, কল-কারখানা, শপিংমল খুলে দেওয়ার ক্ষেত্রে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার শর্ত আরোপ করা হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা লঙ্ঘিত হতে দেখা যায়। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির উপকারভোগী জরিপে ৬৮.২ শতাংশ ওএমএস উপকারভোগীর মতে চাল বিতরণের সময় সামাজিক দূরত্ব মানা হয়নি।

৬.৭ উপসংহার

কমিউনিটি পর্যায়ে সংক্রমণ বিস্তার রোধে বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা ও কৌশল প্রণয়ন করা হলেও সরকারের বিভিন্ন অংশীজনের মধ্যে সমন্বয়হীণতা, তথ্যের ঘাটতি, সক্ষমতার ঘাটতি, জনগণের অসচেতনতা, কঠোর আইন প্রয়োগের ঘাটতি এবং সরকারের পক্ষ থেকে ভুল ও বিভ্রান্তিকর বার্তা প্রদান করার কারণে সংক্রমণের বাহক চিহ্নিতকরণ, সামাজিক দূরত্ব বা লকডাউন ব্যবস্থা কার্যকর হয় নি। সরকারের পক্ষ থেকে জনগণকে সামাজিক দূরত্ব মানতে বলা হচ্ছে আবার অন্যদিকে গণপরিবহন, কল-কারখানা, শপিং মল খুলে দেওয়া হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়

করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সরকারি ক্রয় ও সরবরাহ ব্যবস্থাপনা

করোনা সংকটকালে বিশ্বব্যাপি জীবন রক্ষায় প্রয়োজনীয় চিকিৎসা উপকরণ ও সুরক্ষা সামগ্রীর ব্যাপক চাহিদা তৈরি হয়েছে এবং একইসাথে এর যে বৈশ্বিক সরবরাহ ব্যবস্থা তা ভেঙ্গে পড়েছে এবং এসব উপকরণের ঘাটতি বা সংকট তৈরি করেছে। করোনা সংকট মোকাবিলার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সরবরাহ চাহিদা নিরূপণ এবং প্রয়োজন অনুযায়ী তা সরবরাহ নিশ্চিত করতে একটি বলিষ্ঠ ক্রয় ও সরবরাহ কৌশল থাকার প্রয়োজন। এক্ষেত্রে ক্রয়ের সাথে সম্পৃক্ত সরকারের বিভিন্ন অংশীজনের মধ্যেকার সমন্বয়, ঘাটতি পর্যালোচনা করা, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, ইনভেন্টরি ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করাও জরুরি। কোভিড রোগী শনাক্ত ও চিকিৎসা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে যথাযথ সরবরাহ বজায় রাখতে জাতীয় পরিকল্পনায় ক্রয় ও সরবরাহ সম্পর্কে কিছু কৌশল প্রণয়ন করা হয় যার মধ্যে রয়েছে কোভিড-১৯ সরবরাহ ব্যবস্থায় (কোভিড-১৯ সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট) দিক নির্দেশনা দিতে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন টাস্ক ফোর্স গঠন, ক্রয় কনসোর্টিয়া গঠন, নিয়ন্ত্রণ কক্ষ প্রতিষ্ঠা, সুরক্ষা সামগ্রীর গুণমান পরীক্ষা, সম্পদ ও মজুদ পণ্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি। বিভিন্ন কৌশল গ্রহণ করা হলেও কোভিড মোকাবিলায় পণ্য ও সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনিয়ম-দুর্নীতি পরিলক্ষিত হয়।

৭.১ করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সরকারি ক্রয়: আইন অনুসরণে ঘাটতি

পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮-এর বিধি ৬৮ এবং পাবলিক প্রকউরমেন্ট আইন-২০০৬ (পিপিএ)-এর ৬৪ ধারাতে সুস্পষ্টভাবে বলা আছে যে, যেকোনো বিশেষ মুহূর্তে সরকারি সংস্থা ইচ্ছে করলে সরাসরি ক্রয় প্রক্রিয়ায় যেতে পারে। তবে যে পদ্ধতিতেই ক্রয় করা হোক না কেন বিধিমতে আর্থিক এখতিয়ার আছে এমন প্রতিটি স্তরের অনুমোদন লাগবে। এক্ষেত্রে পাঁচ কোটি টাকা থেকে শুরু করে এর ওপর যেকোনো পরিমাণের অর্থ খরচ করতে হলে প্রথমে অর্থনৈতিক বিষয়সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি (সিসিইএ) থেকে অনুমোদন নিতে হবে। সিসিইএর অনুমোদনের পর তা সিসিজিপি থেকে অনুমোদন নিতে হবে। সরকারি সংস্থার কেনাকাটার ক্ষেত্রে এর বাইরে যাওয়ার আইনগত কোনো সুযোগ নেই।[৬২]

দেশে করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব শুরু হওয়ার পর তিন মাসে (মে-জুলাই) স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে থাকা প্রতিষ্ঠান সেন্ট্রাল মেডিকেল স্টোরস ডিপো (সিএমএসডি) এক হাজার ১২ কোটি ৪৭ লাখ টাকার চিকিৎসা উপকরণ ক্রয় করে। কিন্তু এই বিপুল পরিমাণ অর্থ খরচের ক্ষেত্রে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন-২০০৬ (পিপিএ) এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ (পিপিআর) মানা হয় নি। সরকার প্রণীত বিধিমালা অনুসারে আর্থিক এখতিয়ার অনুযায়ী যেসব স্তরে অনুমোদন নেওয়ার প্রয়োজন ছিল তাও নেওয়া হয় নি বলে অভিযোগ রয়েছে।

৭.২ বিভিন্ন দাতা সংস্থার আর্থিক সহায়তা প্রকল্পের ক্রয়: দুর্নীতি ও আইন অনুসরণে ঘাটতি

৭.২.১ অদক্ষ নামসর্বস্ব প্রতিষ্ঠানকে স্বাস্থ্যের কাজ[৬৩]: করোনা মোকাবিলায় নেওয়া ইমার্জেন্সি রেসপন্স অ্যান্ড প্যানডেমিক প্রিপেয়ার্ডনেস প্রকল্পে (ইআরপিপি) মাস্ক, গ্লাভস ও পিপিইর মতো জরুরি স্বাস্থ্য সুরক্ষাসামগ্রী সরবরাহের জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে নামসর্বস্ব অটোমোবাইল কোম্পানিকে (গাড়ি ব্যবসায়ী) ৩২ কোটি টাকার কাজ দেওয়া হয়েছে। সাড়ে ৯ কোটি টাকা আগাম নিলেও যথাসময়ে কোনো মালামাল সরবরাহ করে নি। টাকা আত্মসাতের অভিযোগ ওঠায় পরবর্তীতে কিছু মাস্ক ও গ্লাভস সরবরাহ করে, যার মধ্যে ২৪ হাজার মাস্ক ব্যবহারের অনুপযোগী। প্রকল্পের ক্রয়ের ক্ষত্রে ই-জিপি অনুসরণ করা হয় নি। সরাসরি ক্রয়ের ক্ষেত্রে একাধিক দরপত্রদাতার কাছ থেকে দর প্রস্তাব আহবানের নিয়ম থাকলেও একমাত্র দরপত্রদাতার নিকট হতে দর প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় যা পিপিআর[৬৪] এর বিধি ৭৫ (২) এর লঙ্ঘন। একক দরদাতার নিকট হতে সরাসরি ক্রয়ের ক্ষেত্রে নির্ধারিত ক্রয়মূল্য সীমা লঙ্ঘন এবং একক দরদাতার নিকট হতে সরাসরি ক্রয় চুক্তির ক্ষেত্রে নির্ধারিত ক্রয়মূল্য সীমা (২০ লক্ষ টাকা) লঙ্ঘন করে ৩১ কোটি টাকার ক্রয় আদেশ প্রদান করে যা ধারা ৭৬ (১)(ঞ) লঙ্ঘন। মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক পেশাগত ও কারিগরি দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা সনদ ও প্রমাণপত্র যাচাই না করে একটি অটোমোবাইল কোম্পানিকে সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহের কাজ দেওয়া হয় যা উক্ত বিধিমালার ধারা ৪৮(২), ৯৮ (১৫) (ক)(গ) লঙ্ঘন। এছাড়াও মালামাল ক্রয়ে সুনির্দিষ্ট বিনির্দেশ প্রস্তুত করতে কারিগরি উপ-কমিটি গঠন না করাও একই বিধিমালার ধারা ৮(১৪) লঙ্ঘন হয়েছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে প্রকল্পের এ বিপুল কেনাকাটায় সরকারি ক্রয় আইন[৬৫] (পিপিএ) ও ক্রয়বিধি[৬৬] (পিপিআর) লঙ্ঘন করা হয়েছে। কোনো প্রকার অভিজ্ঞতা যাচাই ছাড়াই একটি অটোমোবাইল কোম্পানীকে ৩১ কোটি টাকার কাজ দেওয়ার

[৬২] দেশরূপান্তর, হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে নিয়ম ভাঙ্গার খেলা, ২৬ জুলাই ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: https://www.deshrupantor.com/home/printnews/234646/2020-07-26

[৬৩] স্বাস্থ্য অধিদপ্তর গাড়ি ব্যবসায়ীকে স্বাস্থ্যের কাজ। প্রথম আলো, ০৬ অক্টোবর ২০২০।

[৬৪] পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮।

[৬৫] পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮।

[৬৬] পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন-২০০৬।

ক্ষেত্রে যেসব অনিয়ম হয়েছে, তার সঙ্গে প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের যোগসাজশের তথ্যও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তদন্ত প্রতিবেদনে উঠে এসেছে।

৭.২.২ প্রকল্পের অর্থে নিম্নমানের সুরক্ষা সামগ্রী ক্রয়: একই প্রকল্পের অধীন অপর একটি ক্রয়ে চিকিৎসক ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের করোনা সংক্রমণের ঝুঁকি থেকে রক্ষায় সুরক্ষা সামগ্রী পোশাক ক্রয়ের জন্য বরাদ্দ ধরা হয় ৫০ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা, যা প্রতিটি পোশাক বাজার মূল্যের চেয়ে চার-পাঁচগুণ বেশি। প্রস্তাবিত সংখ্যার প্রায় সম পরিমাণ সংখ্যক পিপিই ক্রয় করে খরচ হয়েছে মাত্র ১২ কোটি টাকা। এক্ষেত্রে প্রস্তাবিত মূল্যের চেয়ে অনেক কম মূল্যে পিপিই ক্রয় করা হয়েছে। সরকারের ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর হতে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের ঝুঁকি বিবেচনায় চতুর্থ ধাপের পিপিই ক্রয়ের নির্দেশনা থাকলেও প্রকল্প পরিচালকের একক সিদ্ধান্তে চিকিৎসকদের জন্য প্রথম ধাপের এক লাখের বেশি পিপিই ক্রয়ের অভিযোগ রয়েছে। এসব সুরক্ষা সামগ্রীর মান নিশ্চিত নয় বলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর তাদের গুদামে মাল উঠাতে দেয় নি। পরবর্তীতে প্রকল্পের পরিচালক ঢাকা বাদে ৬৩ জেলায় এক হাজারটি করে এই পিপিই পাঠিয়ে দিয়েছেন।[৬৭]

পিপিইর মান যাচাইয়ের জন্য পাঁচ সদস্যের কমিটি গঠন করা হলেও পিপিই এর মান যাচাই-বাছাই করা হয় নি। চুক্তিপত্রে কমিটি কর্তৃক পিপিইসহ সব সুরক্ষাসামগ্রীর মান পরীক্ষা করে চাহিদার সঙ্গে মিলিয়ে দেখে লিখিত মতামত জানানোর বিষয়ে উল্লেখ থাকলেও এ বিষয়ে কমিটির মতামত নেওয়া হয় নি।

৭.৩ বিভিন্ন হাসপাতালের ক্রয়ে অনিয়ম ও দুর্নীতি

৭.৩.১ ঢাকার কোভিড ডেডিকেটেড হাসপাতালে যন্ত্রপাতি ক্রয়ে দুর্নীতি: হাসপাতালের ক্রয় কমিটিকে অবহিত না করে একটি হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক নিজের শ্যালক ও ভাগ্নের একটি নামসর্বস্ব ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে পিসিআর মেশিন, যন্ত্রপাতি ক্রয়ের কার্যাদেশ প্রদান করে। তবে এই ক্রয়ের ক্ষেত্রে মালামাল সরবরাহ না করেই বিল পরিশোধ করে দেওয়া হয়েছে। উক্ত হাসপাতালে করোনা সময়ে এ ধরনের ৯৩টি ক্রয়ের কার্যাদেশে বিল কারসাজির মাধ্যমে ১২ কোটি ১০ লাখ ৬৫ হাজার ৯০০ টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে। শ্যালক ও ভাগ্নের নামে ভুয়া ট্রেড লাইসেন্স বানিয়ে তত্ত্বধায়ক নিজেই এই ক্রয় কার্য পরিচালনা করে। প্রয়োজন নেই এমন অনেক জিনিসও ক্রয় করা হয়েছে। বিভিন্ন যন্ত্রপাতি বাজার দরের চেয়ে ১০ গুণ বেশি দামে ক্রয় করা হয়েছে। ১০ লাখ টাকা মূল্যের একটি যন্ত্রের দাম দেখানো হয়েছে ৫২ লাখ ৮০ হাজার টাকা। এবং ২৫ লাখ টাকা বাজারমূল্যের পিসিআর মেশিনের দাম ধরা হয়েছে ১ কোটি ৬৫ লাখ টাকা। ক্রয় কমিটির দুই সদস্যকে জরুরি তলব করে পূর্বের বিভিন্ন তারিখের প্রায় অর্ধ শতাধিক স্বাক্ষর আদায় করে নেওয়া হয়েছে।[৬৮]

সারণি ১১: কোভিড ডেডিকেটেড হাসপাতালে যন্ত্রপাতি ক্রয়ে দুর্নীতি

সরঞ্জাম	প্রস্তাবিত ক্রয় মূল্য (টাকা)	বর্তমান বাজার মূল্য (টাকা)
পিসিআর মেশিন	১ কোটি ৬৫ লাখ	২৫ লাখ
ডেফ্রিব্রেটর যন্ত্র	৯ লাখ ৮১ হাজার	২ লাখ ৫০ হাজার
সেন্ট্রাল মাল্টিপারপাস প্যাসেন্ট মনিটর	৫২ লাখ ৮০ হাজার	সর্বোচ্চ ১০ লাখ

এই দুর্নীতির সাথে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের উচ্চ পর্যায়ের একজন কর্মকর্তার সম্পৃক্ততার অভিযোগ রয়েছে। যাকে অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও একটি বিভাগের (স্বাস্থ্য) একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় পরিচালক হিসেবে বদলি করা হয়েছে। এছাড়া এই একই ব্যক্তি হাসপাতালে করোনার চিকিৎসায় নিয়োজিত ডাক্তার, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের থাকা-খাওয়া নিয়ে একজন বিতর্কিত ব্যক্তির সঙ্গে কয়েকগুণ বেশি দামে চুক্তি করেছিলেন। নার্সদের নিম্নমানের খাবার দেওয়া হয়েছে। হাসপাতালের চিকিৎসকদের হোটেলে থাকা ও খাবার বিলেও অসংগতি পাওয়া গেছে। এসব দুর্নীতির প্রতিবাদ করার কারণে এই হাসপাতালের একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে বদলি করা হয়েছে।[৬৯]

৭.৩.২ এন-৯৫ মাস্ক সরবরাহে দুর্নীতি: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) করোনা ইউনিটে দায়িত্বরত চিকিৎসকদের এন-৯৫ মাস্ক দেওয়ার কথা বললেও তাদের নকল মাস্ক দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়। নকল মাস্কগুলোতে বানান ভুল ছিল ও লট নম্বর ছিল না। সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান আসল এন-৯৫ মাস্কেও সাথে কিছু নকল মাস্কও সরবরাহ করেছিল। বিষয়টি নজরে আনা হলে নকল মাস্কগুলো বদলে দেওয়া হয়। তবে তার মধ্যেও নকল ছিল। যথাযথ টেন্ডার

[৬৭] দৈনিক প্রথম আলো, দামে চড়া, মানে খাটো পিপিই হাসপাতালে যাচ্ছেই, প্রথম আলো, ২৩ জুন ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: https://www.prothomalo.com/bangladesh/

[৬৮] দৈনিক ইত্তেফাক, দশগুন বেশি দামে কেনা হয় যন্ত্রপাতি, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: https://www.ittefaq.com.bd/capital/186144/

[৬৯] দৈনিক ইত্তেফাক, প্রাগুক্ত

প্রক্রিয়া অনুসরণ না করা এবং মান যাচাই, যাচাই-বাছাই কমিটি না করেই নিজস্ব লোকদের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষ এসব কেনাকাটা সম্পন্ন করেছে ।[৭০]

৭.৩.৩ একটি প্রকল্পের অধীনে ৮৩টি হাসপাতালে অক্সিজেন ট্যাংক স্থাপনে দুর্নীতি: জুন মাসে দেশের ৮৩টি হাসপাতালে লিকুইড অক্সিজেন ট্যাংক বসানোর উদ্যোগ নিয়েছিল স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়।[৭১] এর মধ্যে ১৪টিতে বাসানো হয়ে গেছে এবং কাজ শেষে চালুর অপেক্ষায় আছে চারটি। বাকিগুলোতে পর্যায়ক্রমে বসবে। সরকারি অর্থায়নে ৫৩টি এবং ইউনিসেফ-এর আর্থিক সহায়তায় ৩০টি হাসপাতালে এ সংক্রান্ত কাজ হচ্ছে।

সারণি ১২: ৮৩টি হাসপাতালে অক্সিজেন সরবরাহ প্রকল্প

অর্থ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান	হাসপাতাল সংখ্যা
সরকারি অর্থায়ন: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	৫৩টি (২০টি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, ২৫টি ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল, ৫টি বিশেষায়িত হাসাপাতা, ১২টি ১০০ শয্যা হাসপাতাল) এছাড়া আরও ২১টি হাসপাতালে নতুন অক্সিজেন ট্যাংক স্থাপন বিবেচনাধীন
ইউনিসেফ কর্তৃক অর্থায়ন	৩০টি দাতা সংস্থা

এর মধ্যে ২৩টি হাসপাতালে সেন্ট্রাল গ্যাস পাইপলাইন এবং লিকুইড অক্সিজেন ট্যাংক স্থাপনে সরাসরি ক্রয়ের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।[৭২] সরসরি ক্রয়ের ক্ষেত্রে একাধিক দরপত্রদাতার কাছ থেকে দর প্রস্তাব আহবানের নিয়ম থাকলেও একমাত্র দরপত্রদাতার নিকট হতে দর প্রস্তাব আহবান করা হয় যা পিপিআর[৭৩] এর ধারা ৭৫ (২) লঙ্ঘন। ৩৯টি সরকারি হাসপাতালে জরুরিভিত্তিতে লিকুইড অক্সিজেন ট্যাংক স্থাপনের ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য গণপূর্ত বিভাগকে অনুরোধ জানানো হয়। অবশিষ্ট ২১টিরও প্রক্রিয়া চলছে। অভিযোগ রয়েছে, কেনাকাটার জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে দর যাচাই কমিটি গঠন করা হয়নি যা পিপিআর[৭৪] এর ধারা ৮১ (২) লঙ্ঘন। যান্ত্রিক বিষয়গুলো দেখভালের জন্য বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলীদের নিয়ে কোনো কমিটি গঠন করা হয়নি যা পিপিআর[৭৫] এর ধারা ৮ (২ উপবিধির ১) লঙ্ঘন। এ অবস্থায় ১৪টি হাসপাতালে কাজ শেষ হয়েছে। এরই মধ্যে কাজ শেষে দুইটির বিল স্বাস্থ্য অধিদফতরে পাঠানো হয়েছে। একটিতে ব্যয় হয়েছে ৪ কোটি টাকা অন্যটিতে ৪ কোটি ২৩ লাখ টাকা। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট-এর মতে ২৫০ শয্যার একটি হাসপাতালে ট্যাংক ও অক্সিজেন লাইন স্থাপনসহ সব ধরনের ব্যয় মিটিয়ে ঠিকাদারের লভ্যাংশসহ আড়াই কোটি টাকার মধ্যে কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব। এক্ষেত্রে প্রতিটি হাসপাতালে ট্যাংক স্থাপনের ক্ষেত্রে দেড় থেকে দুই কোটি টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করা হচ্ছে। এ হিসাবে ৮৩টি হাসপাতালে ট্যাংক স্থাপনে অতিরিক্ত ব্যয় হবে প্রায় ১৬৬ কোটি টাকা।

৭.৩.৪ কোভিড নির্ধারিত হাসপাতাল: করোনা চিকিৎসা ব্যয়ে দুর্নীতি[৭৬]: একটি কোভিড নির্ধারিত সরকারি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে করোনাকালে সরকারি অর্থ ব্যয়ে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। কাপড় ধোলাই, দৈনিক শ্রমিক নিয়োগ, কোয়ারেন্টাইন খাতে ব্যয়, বিধিবহির্ভূত কেনাকাটা, হোটেল বিলে বেশি অর্থ পরিশোধ এবং প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক নিজ নামেই চেকের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অর্থ তুলে নেওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। শুধু করোনাকালে হাসপাতালটিতে ৯৭ লাখ ৫১ হাজার ৯৩৫ টাকার দুর্নীতি হয়েছে। করোনার বিশেষ অর্থ থেকে ব্যয়ের ক্ষেত্রে মানা হয়নি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন-২০০৮, ২০১৬ সালে অর্থ মন্ত্রণালয় হতে জারি করা নির্দেশনা এবং বাংলাদেশ ট্রেজারি রুলসসহ সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান।

৭.৩.৪.১ কাপড় ধোলাইয়ে অতিরিক্ত বিল: এ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ময়লা কাপড় ধোলাইয়ের জন্য ২ লাখ ৪৭ হাজার ৫০৫ টাকা খরচ করেছে। চলতি বছর ২৮ জুন একটি প্রতিষ্ঠানকে পুরো অর্থও পরিশোধ করা হয়েছে। যদিও গত ১৫ এপ্রিল স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী জারি করা অফিস আদেশে খরচের এ খাতটি কোয়ারেন্টাইনবহির্ভূত।

৭.৩.৪.২ অতিরিক্ত হোটেলে রুমপ্রতি ভাড়া: করোনাভাইরাসের সময়ে একটি হোটেলের সঙ্গে চিকিৎসকদের থাকার জন্য একটি হাসপাতাল রুম প্রতি ২ হাজার ৫০০ টাকায় চুক্তি করে কিন্তু অপর একটি হাসপাতাল একই হোটেলে সাথে রুম প্রতি ৩ হাজার

[৭০] বাংলা ট্রিবিউন, নকল মাস্ক সরবরাহের ঘটনায় বঙ্গবন্ধু মেডিক্যালের মামলা, ২৪ জুলাই ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: https://www.banglatribune.com/others/news/634175/
[৭১] নিশ্চিত হয়নি নিরবচ্ছিন্ন অক্সিজেন সরবরাহ। প্রথম আলো, ২৫ অক্টোবর, ২০২০।
[৭২] কোভিড-১৯ চিকিৎসায় উদ্যোগ, অক্সিজেন ট্যাংক ৮৩ হাসপাতালে। যুগান্তর, ১২ জুলাই ২০২০।
[৭৩] পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮।
[৭৪] পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮।
[৭৫] পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮।
[৭৬] দেশ রূপান্তর, ঢাকা মহানগর জেনারেল হাসপাতাল: করোনায় কোটি টাকার দুর্নীতি, ২১ অক্টোবর ২০২০।

১০০ টাকার চুক্তি করে। রুমপ্রতি দৈনিক ৬০০ টাকা বেশি পরিশোধ করায় সরকারি কোষাগার থেকে ৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা বেশি অর্থ খরচ হয়েছে।

৭.৩.৪.৩ দেয়ালে রং, বার্নিশ ও চেয়ার-টেবিল কেনাকাটায় নিয়ম-বহির্ভূত খরচ: একটি হাসপাতালে টেবিল-চেয়ার ক্রয়, বার্নিশ, দেয়াল রং, প্লাস্টিক পাইপ ক্রয়, টিন দিয়ে বেড়া তৈরি, গ্যাস সংযোগ, পাইপলাইন মেরামত ও চুলা ক্রয় বাবদ রক্ষণাবেক্ষণের নিজস্ব তহবিল থাকার পরও করোনাকালে দেওয়া বিশেষ বরাদ্দের কোয়ারেন্টাইন ব্যয় থেকে বিধিবহির্ভূতভাবে ২ লাখ ৪১ হাজার ৯০০ টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

৭.৩.৪.৪ দৈনিকভিত্তিক মজুরিতে দুর্নীতি: একই হাসপাতালে কোভিড-১৯-এর চিকিৎসাকাজে নিয়োজিত নার্সসহ কিছুসংখ্যক স্বাস্থ্যকর্মীর জন্য আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু এ দুটি প্রতিষ্ঠানে অবস্থানরতদের দেখভালের জন্য দৈনিকভিত্তিক মজুরি দেখিয়ে জনপ্রতি ৬২৫ টাকা করে মোট ৪ লাখ ৯১ হাজার ২৫০ টাকা খরচ দেখানো হয়েছে। দৈনিক মজুরিভিত্তিক শ্রমিকের কথা বলা হলেও সেখানে মাত্র পাঁচজনের নামে এ অর্থ ছাড় করেছেন সংশ্লিষ্টরা।

৭.৩.৪.৫ সাতটি বিলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক ৩২ লাখ টাকা দুর্নীতি: কোভিড আক্রান্তদের চিকিৎসায় নিয়োজিত চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের খাওয়া-দাওয়াবাবদ মোট ৩২ লাখ ৩ হাজার ২৭৫ টাকা খরচ দেখানো হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী যে প্রতিষ্ঠান বিল জমা দেবে সেই প্রতিষ্ঠানের নামে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা চেক ইস্যু করবেন। কিন্তু এ বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে সরকারি কোষাগার থেকে অর্থ ব্যয়ের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিজ নামেই চেক ইস্যু করে সরকারি কোষাগার থেকে টাকা তুলে নিয়েছেন।

৭.৩.৪.৬ আনুষঙ্গিক ব্যয়ে দুর্নীতি: একই হাসপাতালে করোনা ইউনিট চালুর পর ৮ লাখ ৮৮ হাজার টাকা আনুষঙ্গিক খরচ দেখিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। তিনটি টোকেনের মাধ্যমে পরিশোধ করা এ অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রেও মানা হয়নি অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে জারি করা নির্দেশনা।

৭.৩.৪.৭ পদে পদে নিয়মের ব্যত্যয়: করোনাকালে উল্লিখিত হাসপাতালটিতে কেনাকাটাসহ প্রায় সকল ধরনের অর্থ ব্যয়ে মানা হয় নি সরকারের বিধিবিধান। হোটেলকে ৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা অতিরিক্ত বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে পিপিআর-২০০৮-এর ১৫(২) বিধি লঙ্ঘন করা হয়েছে। এ হোটেলকে মোট ৪২ লাখ ৩০ হাজার ৫ টাকা পরিশোধে একই আইনের ৭৫(৩) বিধিও লঙ্ঘন করা হয়। প্রতিষ্ঠানটিতে অর্থ খরচের দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তা নিজ নামেই বিপুল পরিমাণ অর্থ তুলে নিয়েছেন, যা বাংলাদেশ ট্রেজারি রুলসের প্রথম খণ্ডের ধারা ২৪২(১) লঙ্ঘন। এই হাসপাতালে ২৫ মার্চ থেকে ১৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কোভিট ইউনিট চালু ছিল। ৫৬ জন ডাক্তার, ৪৩ জন নার্স ও বেশকিছু স্বাস্থ্যকর্মী কাজ করেছেন। হোটেলে ছিলেন ২৫ জন ডাক্তার। আর নার্সসহ অন্যরা ছিলেন সরকারি অন্য প্রতিষ্ঠানে। কিন্তু যারা নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ছিলেন তারা সরকার নির্ধারিত টাকা পেয়েছেন।' হোটেলের সঙ্গে চুক্তি সরকারের একটি সংস্থা থেকে করা হয়েছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে সরকারি দুটি প্রতিষ্ঠানে আবাসন ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেখানে তারা নিজেরা অর্থ পরিশোধ করেছে। পরিস্থিতির কারণে লোকজন পাওয়া যাচ্ছিল না বলে কিছুটা বেশি অর্থে এ কাজটি করতে হয়েছে।'

৭.৪ উপসংহার

সারাদেশে করোনা চিহ্নিত করতে পরীক্ষাগার এবং চিকিৎসা ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে জীবন রক্ষাকারী প্রয়োজনীয় চিকিৎসা উপকরণ ক্রয় ও সরবরাহ জারি রাখা অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ একটি কাজ। এই কার্যক্রম সচল রাখতে জাতীয় পরিকল্পনায় বেশ কিছু কৌশল নির্ধারণ ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হলেও এখনো জাতীয় ও বিভিন্ন হাসপাতাল পর্যায়ের ক্রয় ও সরবরাহে অনিয়ম-দুর্নীতি অব্যাহত রয়েছে। যা একদিকে প্রয়োজনীয় সরবরাহের ঘাটতি তৈরি করছে অপরদিকে এসব মানহীন উপকরণ নমুনা পরীক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থাকে বাধাগ্রস্ত করছে। মানহীন সুরক্ষা সামগ্রী অনেক চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীর করোনায় আক্রান্ত হওয়া ও মৃত্যুর অন্যতম একটি কারণ।

অষ্টম অধ্যায়

করোনা ভাইরাসের প্রভাব মোকাবিলায় প্রণোদনা কর্মসূচি

করোনা ভাইরাসের অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবিলায় সর্বপ্রথম ২০২০ সালের ২৫ মার্চ করোনাভাইরাস মহামারিতে ক্ষতিগ্রস্ত রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য পাঁচ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়, এবং ৫ এপ্রিল করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে দেশের সম্ভাব্য অর্থনৈতিক প্রভাব উত্তরণে নতুন করে ৬৭ হাজার ৭৫০ কোটি টাকার প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়। পরবর্তীতে ১২ এপ্রিল ক্ষুদ্র ও মাঝারি চাষিদের জন্য ৫ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনার ঘোষণা দেওয়া হয়। এরই ধারাবহিকতায় সর্বশেষ ৩১ মে ১৯তম প্যাকেজ হিসেবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যাংকঋণ গ্রহীতাদের দুই মাসের সুদ মওকুফ করতে সরকারের পক্ষ থেকে দুই হাজার কোটি টাকার আরেকটি প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়। এই ১৯টি প্রণোদণা প্যাকেজের মোট পরিমাণ এক লাখ ৩ হাজার ১১৭ কোটি টাকা, যা ১২.১৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ এবং জিডিপির ৩.৭ শতাংশ।[৭৭] পরবর্তীতে প্রণোদনা প্যাকেজের সংখ্যা এবং টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি হয়ে মোট ২০টি প্যাকেজে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় এক লাখ ১১ হাজার ১৪১ কোটি টাকা।

গত পাঁচ মাসে প্রণোদনার এই অর্থ সঠিক উপকারভোগীর নিকট পৌছানোর ক্ষেত্রে নানা ধরনের চ্যালেঞ্জ লক্ষ করা যায়। অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত এই প্রণোদনার মাত্র ২৬ শতাংশ বিতরণ করা হয়েছে।[৭৮]

৮.১ প্রণোদনা বিতরণ: সাড়া প্রদানে ঘাটতি

এই ২০টি প্রণোদনা প্যাকেজের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের অধীনে থাকা ৮টি প্যাকেজের মোট প্রণোদনার পরিমাণ ৮৫,৭৫০ কোটি টাকা, যা বিভিন্ন ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণ হিসেবে প্রদান করা হয়। গত এপ্রিল মাস হতে চালু হওয়া এই কর্মসূচির অধীনে দেওয়া ঋণের সুদহার ২ থেকে ৫ শতাংশ। অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত ব্যাংকগুলো সরকারের ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের প্রায় ৫৪ শতাংশ বা ৪৬ হাজার ২৫২ কোটি টাকা বিতরণ করেছে। এই প্যাকেজের আওতায় বড়দের ঋণ দেওয়ার ব্যাপারে ব্যাংকগুলো বেশ সক্রিয় থাকলেও ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি (সিএমএসএমই) এবং প্রাক-জাহাজীকরণ পুনঃ অর্থায়ন কর্মসূচি খাতে ঋণ বিতরণে তাদের আগ্রহ এখনো কম। বাংলাদেশ ব্যাংক চিঠি, নোটিশ ও তদারকি বাড়িয়েও এসব খাতে ব্যাংকগুলোর ঋণ বিতরণে গতি বাড়াতে পারছে না। বৃহৎ শিল্প ও রপ্তানি খাতে উচ্চ হারে (৭৩%-১০০%) প্রণোদনা বিতরণ করা হলেও মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্প, প্রান্তিক কৃষক ও নিম্ন আয়ের মানুষের ক্ষেত্রে বিতরণ হার খুবই কম (২১%-৪২%)। এসব ক্ষেত্রে প্রণোদনা বিতরণে ব্যাংকগুলোর অনীহার অভিযোগ রয়েছে।

সারণি ১৩: বাংলাদেশ ব্যাংকের অধীনে বিভিন্ন প্রণোদনা প্যাকেজ বিতরণের হার

বাংলাদেশ ব্যাংকের অধীনে প্রণোদনা প্যাকেজ	মোট অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা)	বিতরণের হার
বৃহৎ শিল্প ও সেবা খাতের ঋণ সুবিধা*	৩৩,০০০	৭৮%
ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ঋণ সুবিধা	২০,০০০	২১%
রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (ইডিএফ)	১২,৭৫০	৭৩%
রপ্তানিমুখী শিল্প শ্রমিকদের বেতন-ভাতা পরিশোধে ঋণ সুবিধা**	৫,০০০	১০০%
কৃষি পুনঃ অর্থায়ন স্কিম	৫,০০০	৪২%
নিম্ন আয়ের পেশাজীবীর (কৃষক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী) জন্য পুনঃ অর্থায়ন স্কিম	৩,০০০	৩৬%
দুই মাসের ঋণের সুদ 'ব্লকড হিসাবে' স্থানান্তর	২,০০০	০%
প্রাক-জাহাজীকরণ পুনঃ অর্থায়ন তহবিল	৫,০০০	০%
মোট	**৮৫,৭৫০**	**৫৪%**

** ৩০ অক্টোবর ২০২০ তারিখে বৃহৎ শিল্প ও সেবা খাতের ঋণ সুবিধা প্যাকেজে প্রণোদনার পরিমাণ সাত হাজার কোটি টাকা বৃদ্ধি করে ৪০ হাজার কোটি টাকা করা হয়*[৭৯]

*** রপ্তানিমুখী শিল্প শ্রমিকদের বেতন-ভাতা পরিশোধে ঋণ সুবিধা প্যাকেজে তিন দফায় বৃদ্ধি করে ১০ হাজার ৫০০ কোটি টাকা প্রণোদনা প্রদান*[৮০]

---

[৭৭] টিআইবি, করোনা ভাইরাস সংকট মোকাবিলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ, ১৫ জুন ২০২০, ঢাকা

[৭৮] দৈনিক প্রথম আলো, ছোটরা ব্যাংকের দ্বারে দ্বারে, ৪ অক্টোবর ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: https://www.prothomalo.com/business/bank/

[৭৯] দেশ রূপান্তর, বড় শিল্পে প্রণোদনা বাড়ল ৭০০০ কোটি টাকা, ৩০ অক্টোবর ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: https://www.deshrupantor.com/business-print/2020/10/30/255256

[৮০] দৈনিক কালের কণ্ঠ, পোশাক খাতে বিপুল প্রণোদনার পরেও মজুরি পাননি ২১ হাজার কর্মী, ১২ অক্টোবর ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: https://www.kalerkantho.com/online/business/2020/10/12/964689

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা বিভিন্ন ব্যাংকে গিয়ে প্রণোদনা তহবিল থেকে ঋণ পাচ্ছেন না। ব্যাংকের বিভিন্ন শাখা নিয়মনীতির অজুহাতে গ্রাহকদের ফিরিয়ে দিচ্ছে। অনেক শাখায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঘোষিত প্যাকেজের নীতিমালা পৌঁছেনি। কোনো কোনো ব্যাংকের শাখা প্রণোদনা প্যাকেজের ঋণ বিতরণের বিষয়ে অবহিত ছিল না। মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্প, প্রান্তিক কৃষক খাতে ঋণ বিতরণ কম হওয়ার প্রধান কারণ ঋণ বিতরণ নীতিমালার কঠিন শর্ত, যদিও ইতোমধ্যে নীতিমালা সহজ করতে বাংলাদেশ ব্যাংক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এছাড়া ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পসহ ছোট উদ্যোক্তা কর্তৃক ঋণের বিপরীতে ঠিকমতো কাগজ জমা দিতে না পারা, কৃষিঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে বেসরকারি ব্যাংকগুলোর নেটওয়ার্ক ও দক্ষ কর্মীর অভাব, ঋণের পরিমাণ কম হওয়া, খরচের তুলনায় সুদ হার কম হওয়ার কারণে ব্যাংকগুলো ঋণ প্রদানে অনীহা প্রকাশ করছে।

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও প্রান্তিক কৃষকেরা প্রণোদনা না পেলেও বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা), বাংলাদেশ রফতানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেপজা) এবং বাংলাদেশ হাই-টেক পার্কের বিদেশী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানও সরকারের ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ থেকে ঋণ পাবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি সার্কুলারের মাধ্যমে রফতানি বাণিজ্যে জড়িত দেশীয় প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বিদেশী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোর আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ওইসব প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ও কর্মসংস্থান অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজের সুবিধাগুলো বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা), বাংলাদেশ রফতানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেপজা) এবং বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের এলাকায় অবস্থিত 'এ', 'বি' ও 'সি' টাইপ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

৮.২ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে সাড়া প্রদানে ঘাটতি

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর একটা বড় অংশ করোনাকালে সরকারের প্রণোদনা সহায়তা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়েছে। তিন পার্বত্য জেলা ও সমতলে সাঁওতালসহ অন্য জাতিগোষ্ঠীর মাত্র ৪ হাজার ১০০টি উপকারভোগী পরিবার সরকারি সুবিধা পেয়েছে, যা এসব পরিবারের ২৫ শতাংশ। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় বাড়ছে বেকারত্ব ও অভাব। সমতল নৃগোষ্ঠীদের একটি বড় অংশ অনাহারে বা অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছেন। নৃগোষ্ঠীদের জন্য যে ত্রাণ তা খুবই অপ্রতুল। অন্যদিকে ২১ হাজার ৮২৬ জন দলিত ও হরিজন, ২৯ হাজার ৬৩১ জন প্রতিবন্ধী, ৪৯ হাজার ২৩৯ জন জেলে এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত সময়কালে সরকারি কোনো সহায়তাই পাননি।

করোনাকালে প্রণোদনা সহায়তার অংশ হিসেবে সরকার ভিজিএফ এবং ভিজিডি কর্মসূচির আওতায় খোলাবাজারে কম দামে চাল বিক্রি এবং সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির উদ্যোগ নিয়েছিল। এছাড়া সরকার করোনাকালে ৫০ লাখ দুস্থ মানুষের মাঝে বিতরণের জন্য ১ হাজার ২৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল। কিন্তু জুলাই মাসের ৭ তারিখ পর্যন্ত মাত্র ১৬ লাখ মানুষ এই টাকা পায়[৮১] এবং বর্তমান সময় পর্যন্ত দুই-তৃতীয়াংশ উপকারভোগী এই সুবিধা পেয়েছে পেয়েছেন। স্থানীয় সরকারের তৈরি উপকারভোগী তালিকায় অনেক গরমিল থাকায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ সরকারের ত্রাণ হতে বঞ্চিত হচ্ছে।[৮২]

বেসরকারি সংগঠন ইনডিজিনাস পিপলস ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেসের (আইপিডিএস) এপ্রিল থেকে জুলাই পর্যন্ত সময়ে পরিচালিত এক গবেষণায় ওঠে আসে যে, করোনাকালে দেশের সমতলের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে ৯২ ভাগের আয় কমে গেছে। তাদের মধ্যে পাঁচ লাখ মানুষ নতুন দরিদ্র হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশে বসবাসরত ৫০টির বেশি আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে ২৮টি জেলার সমতল ভূমিতে বসবাস করে ৩৫টি জনগোষ্ঠী যার জনসংখ্যা ২০ লাখের বেশি। গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়, করোনা সংকট অতিদ্রুত ও মারাত্মক আকারে সমতলের আদিবাসীদের জীবন ও জীবিকার ওপর প্রভাব ফেলে। অতিদরিদ্রসীমার নিচে থাকা মানুষের সংখ্যা ৬২ শতাংশের নিচে চলে যায়। সমতলের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর অধিকাংশই দিনমজুরি, বিউটি পারলার, গার্মেন্টস, গৃহপরিচারিকা, সিকিউরিটি গার্ড, ড্রাইভার, বিক্রয়কর্মী হিসেবেই বেশি কাজ করে থাকে। করোনাকালে এই বেতনভোগীদের ৭২ শতাংশ চাকরি হারিয়েছেন কিংবা কর্মক্ষেত্র বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। যাঁরা চাকরিতে আছেন তাঁদের ২০ শতাংশ আংশিক বেতন পাচ্ছেন। এই জনগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে সরকার কর্তৃক ৫০ লাখ পরিবারকে আর্থিক সহায়তার ক্ষেত্রে সমতলের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর অন্তত ৫০ হাজার মানুষ রাখার অনুরোধ করা হয়েছে।[৮৩]

হরিজন পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা কাজ করার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের সুরক্ষা সামগ্রী পায় নি। চিকিৎসকসহ স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য প্রণোদনা ভাতার ঘোষণা থাকলেও পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের জন্য কোনো প্রণোদনা দেওয়া হয় নি।

৮.৩ স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রণোদনা প্রদানে দীর্ঘসূত্রতা

[৮১] ডেইলি স্টার, শাহানা হুদা রঞ্জনা, 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর আত্ম-অধিকার অস্বীকারের মানে, নিজেদের অধিকার অস্বীকার', ৯ আগস্ট ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: https://www.thedailystar.net/bangla/166589

[৮২] ডেইলি স্টার, Covid-19 Stimulus Package: Disparity in disbursement, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: https://www.thedailystar.net/frontpage/news/covid-19-stimulus-package-disparity-disbursement-1969109

[৮৩] দৈনিক প্রথম আলো, করোনায় সমতলের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর ৫ লাখ নতুন দরিদ্র: গবেষণা, ২৭ আগস্ট ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: https://www.prothomalo.com/business/

জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীদের সরাসরি সেবা দিতে গিয়ে স্বাস্থ্যকর্মীদের অনেকে করোনায় আক্রান্ত হন এবং তাঁদের অনেকেই মৃত্যুবরণ করেছেন। তাদের এই ত্যাগের বিষয়টি বিবেচনা করে করোনাভাইরাসের সম্মুখযোদ্ধা (যারা সরাসরি চিকিৎসাসেবা দিয়েছেন) ডাক্তার-নার্সসহ স্বাস্থ্যকর্মীদের বিশেষ প্রণোদনার ঘোষণা করা হয়। গত ৯ জুলাই অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে বিশেষ প্রণোদনা হিসেবে অতিরিক্ত দুই মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ এককালীন বিশেষ সম্মানী হিসেবে সরকারি চাকরিজীবীদেও গ্রেড অনুযায়ী এ প্রণোদনা দেওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়। কিন্তু চার মাস অতিবাহিত হলেও এই প্রণোদনা এখনো স্বাস্থ্যকর্মীদের দেওয়া হয় নি। বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের (বিএমএ) এবং সোসাইটি ফর নার্সেস সেফটি অ্যান্ড রাইটসের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ২২ অক্টোবর ২০২০ পর্যন্ত সারা দেশে সাত হাজার ২৪৯ জন চিকিৎসক, নার্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। এর মধ্যে ১০০ জন চিকিৎসক ও ১০ জন নার্স মারা গেছেন।[৮৪]

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সেবাদানকারী চিকিৎসক-নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীসহ সরকারি নির্দেশনা বাস্তবায়নে থাকা মাঠ প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী ও সশস্ত্র বাহিনী এবং প্রত্যক্ষভাবে নিয়োজিত প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীরা দায়িত্ব পালনকালে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৩ এপ্রিল অর্থ মন্ত্রণালয় হতে জারি করা পরিপত্রে বলা হয়, '১৫ -২০তম গ্রেডের কেউ আক্রান্ত হলে পাঁচ লাখ টাকা, আর মারা গেলে পাবেন ২৫ লাখ টাকা। ১০ থেকে ১৪তম গ্রেডের কেউ আক্রান্ত হলে পাবেন সাত লাখ, আর মারা গেলে পাবেন ৩৭ লাখ টাকা। আর প্রথম থেকে নবম গ্রেডের কেউ আক্রান্ত হলে ১০ লাখ টাকা, আর মারা গেলে তার জন্য ৫০ লাখ টাকা পাবেন। করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করা প্রথম চিকিৎসকের পরিবার ক্ষতিপূরণ পেলেও অন্য স্বাস্থকর্মীগণ এখনো ক্ষতিপূরণ পান নি। প্রণোদনার ক্ষেত্রে সম্প্রতি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে কোভিড-১৯ চিকিৎসায় যারা 'সরাসরি জড়িত' তাদের নামের তালিকা চাওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় 'কোভিড-১৯ চিকিৎসায় সরাসরি জড়িত' বলতে কেবল কোভিড ডেডিকেটেড হাসপাতালে দায়িত্ব পালন করা চিকিৎসক, নার্সসহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের বুঝিয়েছে বলে ব্যাখ্যা দিয়েছে। এর ফলে যেসব হাসপাতাল কোভিড ডেডিকেটেড হিসেবে ঘোষণা করা হয় নি সেসব হাসপাতালের স্বাস্থ্যকর্মীরা এ প্রণোদনা থেকে বঞ্চিত হবেন।

প্রত্যেক স্বাস্থ্যকর্মী হাসপাতালের দেওয়া নিরাপত্তা সামগ্রীর পাশাপাশি নিজেরাও আলাদা সামগ্রী কিনে ব্যবহার করতে বাধ্য হচ্ছেন। ফলে সরকারি দায়িত্ব পালনের সময় তাদের বেতনের একটা অংশ খরচ হচ্ছে। দায়ত্ব পালন করতে গিয়ে আক্রান্ত হওয়া বা দায়িত্ব পালনে নিজের বেতনের অংশ খরচ করলেও চিকিৎসক ও নার্সরা প্রণোদনার কিছুই পাননি। উপরন্তু, নবনিযুক্ত ২,০০০ চিকিৎসকের বেতন-ভাতা দাপ্তরিক জটিলতায় বন্ধ থাকার পর মাত্র চালু হলেও বেশিরভাগ চিকিৎসকই ঈদুল ফিতরের বোনাস এখনো বুঝে পাননি। করোনার সংক্রমণের প্রথম দিকে চিকিৎসকদের কোয়ারেন্টিনের জন্য হোটেল দেওয়া হলেও সেটা এখন বন্ধ রয়েছে। চিকিৎসকদের বাসায় অবস্থান করার ফলে তাদের পরিবারের সব সদস্যদের ঝুঁকিতে ফেলছে।[৮৫]

৮.৪ উপসংহার

করোনা সংক্রমণের অর্থনৈতিক ক্ষয়-ক্ষতি মোকাবিলার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন খাতের পুনরুদ্ধারের জন্য ঋণ হিসেবে ২০টি প্যাকেজে প্রণোদনা ঘোষণা করা হয়। তবে প্রণোদনা বিতরণের ক্ষেত্রে বৃহৎ ও রপ্তানী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে গুরুত্ব দেওয়া হলেও ক্ষুদ্র, মাঝারি শিল্প ও প্রান্তিক কৃষকদের প্রণোদনা বিতরণের ক্ষেত্রে অনীহা ও অবহেলা লক্ষ করা যায় এবং প্রণোদনররার খুব ক্ষুদ্র একটা অংশ বিতরণ করা হয়। এছাড়া সমাজের সুবিধা বঞ্চিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বড় একটি অংশ এখনো কোনো ধরনের সুবিধার আওতায় আসে নি। অর্থাৎ সমাজের সুবিধাভোগী অংশের অনুকূলে অধিক সুবিধা প্রদান করা হলেও সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত অংশকে এখনো বঞ্চিত করা হচ্ছে। এছাড়া করোনা মোকাবিলায় সম্মুখসারির যোদ্ধারা এখনো প্রণোদনা পায় নি, যা সার্বিকভাবে করোনা মোকাবিলার কার্যক্রমকে প্রভাবিত করতে পারে।

[৮৪] দৈনিক যুগান্তর, ঝুলে আছে ১ শ' কোটি টাকা, ২২ অক্টোবর ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/357291/

[৮৫] বাংলা ট্রিবিউন, ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন ডা. মঈনের পরিবার, বাকীগুলো চলছে যাচাই বাছাই, ৩০ আগস্ট ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: https://www.banglatribune.com/others/news/639763/%

ত্রাণ ও সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি

সরকার দুস্থ ও অতি দরিদ্র ব্যক্তি ও পরিবারকে মানবিক সহায়তা প্রদানে বেশ কিছু ত্রাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। এর অন্যতম দুইটি কার্যক্রম হচ্ছে করোনা ভাইরাস পরিস্থিতিতে কর্মহীন হয়ে পড়া দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত ব্যক্তি বা পরিবারকে কার্ডের মাধ্যমে বিশেষ ওএমএস চাল (১০ টাকা কেজিতে) এবং ৫০ লাখ হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে আড়াই হাজার টাকা করে নগদ সহায়তা প্রদান। তবে এই গবেষণায় এ দুইটি কর্মসূচির উপকারভোগীর ওপর পরিচালিত জরিপে অনিয়ম-দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনার চিত্র উঠে আসে। নিম্নে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে অনিয়ম-দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনার চিত্র তুলে ধরা হলো।

৯.১ সরকারি সহায়তায় তালিকাভুক্তি: অনিয়ম-দুর্নীতি

জরিপে নগদ সহায়তায় উপকারভোগীর ৩০ শতাংশ এবং ওএমএস কার্ড উপকারভোগীদের ২৩.৫ শতাংশ জানায় তালিকায় হতদরিদ্র ব্যক্তি বা পরিবারকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। এছাড়া ৬.২ শতাংশ উপকারভোগীর ক্ষেত্রে ফোন নাম্বার ও সুবিধাভোগীর নাম সঠিক ছিল না এবং সুবিধাভোগীকে উক্ত নাম্বারে পাওয়া যায় নি। সাম্প্রতিক সময়ে প্রকাশিত এক গবেষণায় দেখা যায়, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় যাদেরকে সুবিধা দেওয়া হচ্ছে তাদের ৬৫.৫ শতাংশ সুবিধাভোগী দরিদ্র নয় (নির্বাচিত হচ্ছে ধনী পরিবার থেকে)।[৮৬] অপর একটি প্রতিবেদন হতে জানা যায়, নগদ সহায়তা তালিকায় সরকারি কর্মচারী প্রায় তিন হাজার, পেনশনভোগী প্রায় সাত হাজার এবং প্রায় তিন লাখ উপকারভোগীকে একাধিকবার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।[৮৭]

৯.১.১ উপকারভোগী হিসেবে তালিকাভুক্ত ব্যক্তির ধরন: জরিপে নগদ সহায়তার তালিকায় আর্থিকভাবে স্বচ্ছল ব্যক্তি (৭১.৩%), জনপ্রতিনিধি/রাজনৈতিক নেতার আত্মীয়-স্বজন (৪৬.৪%) এবং একই পরিবারের একাধিক ব্যক্তিকে (১১.৬%) অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অন্যদিকে বিশেষ ওএমএস কার্ডের তালিকায় আর্থিকভাবে স্বচ্ছল ব্যক্তি (৬৬.৭%), ডিলার এর আত্মীয়-স্বজন (৩১.৪%), একই পরিবারের একাধিক ব্যক্তি (১৭.২%) এবং বেসরকারি চাকুরিজীবীকে (১২.৫%) অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এক প্রতিবেদন হতে জানা যায়, নগদ টাকা কর্মসূচির তালিকায় ৩০৬টি নামের পাশে চারজনের মুঠোফোন-ব্যাংক নাম্বার প্রদান করা হয় - এই ব্যাংক নাম্বারগুলো ছিল ইউপি চেয়ারম্যানের আত্মীয় এবং পরিচিত ব্যবসায়ী। এছাড়াও নগদ সহায়তার তালিকায় নাম থাকা অনেকে টাকা পেলেও অনেক পরিবার এখনো আবার টাকা পায় নি।[৮৮] বিশেষ ওএমএস কার্যক্রমের আওতায় ১০ টাকা কেজি দরে চাল বিতরণের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, পৌরসভার কাউন্সিলর অনিয়ম করে নিজের পরিবারের স্বচ্ছল সদস্য ও আত্মীয়-স্বজনসহ ১৬ ব্যক্তির নাম ওএমএসের উপকারভোগী তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেন।[৮৯]

সারণি ১৪: তালিকাভুক্ত ব্যক্তিদের ধরন (একাধিক উত্তর)

তালিকাভুক্তদের ধরন	নগদ সহায়তা (%)	ওএমএস চাল (%)
আর্থিকভাবে স্বচ্ছল ব্যক্তি	৭১.৩	৬৬.৭
জনপ্রতিনিধি/রাজনৈতিক নেতার আত্মীয়-স্বজন	৪৬.৪	৬.৩
ডিলার এর আত্মীয়-স্বজন	-	৩১.৪
একই পরিবারের একাধিক ব্যক্তি	১১.৬	১৭.২
বেসরকারি চাকরিজীবী	৮.১	১২.৬
বড় ব্যবসায়ী	৫.৮	৭.৩
সরকারি চাকরিজীবী	২.০	৪.৩

[৮৬] বিস্তারিত, https://www.prothomalo.com/business/analysis/

[৮৭] বিস্তারিত, https://www.somoynews.tv/pages/details/222718/, 8 July, 2020

[৮৮] বিস্তারিত, https://sylhetvoice.com/ প্রধানমন্ত্রীর-ঈদ-উপহার/ , https://www.protidinersangbad.com/whole-country/224385/ধুনটে-প্রধানমন্ত্রীর-মানবিক-সহায়তা-পায়নি--৬-হাজার-মানুষ, https://www.deshrupantor.com/editorial-news/2020/05/21/219631

[৮৯] বিস্তারিত, https://www.dailyinqilab.com/article/317234/

৯.১.২ তালিকাভুক্তিতে অনিয়ম-দুর্নীতির ধরন: জরিপে নগদ সহায়তা উপকারভোগীদের ১২ শতাংশ তালিকাভুক্ত হতে অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছিল। এক্ষেত্রে প্রভাবশালী ব্যক্তির সুপারিশ জোগাড় করা (৩৬.১%), অনেকবার অনুনয়-বিনয়/অনুরোধ করা (২৪.৬%), নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ বা ঘুষ দেওয়া (১৮.৯%), টাকা না পাওয়া (১০.৭%) ইত্যাদি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। তালিকাভুক্ত হতে গড়ে ২২০ টাকা করে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ বা ঘুষ দিতে হয়। অন্যদিকে জরিপে কার্ডের মাধ্যমে বিশেষ ওএমএস চাল (১০ টাকা কেজি দরে) সহায়তায় উপকারভোগীদের ১০ শতাংশ তালিকাভুক্ত হতে অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছিল। এক্ষেত্রে প্রভাবশালী ব্যক্তির সুপারিশ জোগাড় করা (৩৭.১%), অনেকবার অনুনয়-বিনয়/অনুরোধ করা (২০.৬%), নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ বা ঘুষ দেওয়া (১৫.৫%) ইত্যাদি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল।

সারণি ১৫: তালিকাভুক্তিতে অনিয়ম-দুর্নীতির ধরন

সমস্যা বা প্রতিবন্ধকতার ধরন	নগদ সহায়তা (%)	ওএমএস চাল (%)
প্রভাবশালী ব্যক্তির সুপারিশ যোগাড় করতে হয়েছে	৩৬.১	৩৭.১
অনেকবার অনুনয়-বিনয়/অনুরোধ করতে হয়েছে	২৪.৬	২০.৬
নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ বা ঘুষ দিতে হয়েছে	১৮.৯	১৫.৫
টাকা পায়নি	১০.৭	-
রাজনৈতিক পরিচয়ের প্রমাণ/সাক্ষ্য দিতে হয়েছে	৯.৯	৬.২

৯.২ সহায়তা পেতে অনিয়ম ও দুর্নীতি

৯.২.১ নগদ সহায়তায় অনিয়ম-দুর্নীতি: জরিপে নগদ সহায়তায় উপকারভোগীদের ৫৬ শতাংশ সহায়তা পেতে অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছিল। এক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরনের মধ্যে ছিল, তালিকায় নাম থাকা সত্ত্বেও এখনো টাকা না পাওয়া (৬৯.০%), মোবাইল ব্যাংকিং এজেন্ট কর্তৃক কমিশন/ফি কেটে রাখা (২৬.৬%) ইত্যাদি। নগদ টাকা তুলতে মোবাইল ব্যাংকিং এজেন্ট কর্তৃক কমিশন/ফি বাবদ গড়ে ৬৮.২০ টাকা করে কেটে রাখা হয়। এক প্রতিবেদন হতে জানা যায়, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে নগদ অর্থ সহায়তা কর্মসূচির উপকারভোগীদের কাছ থেকে ৪০০ থেকে ৫০০ টাকা করে আদায় করেন।[৯০]

সারণি ১৬: নগদ সহায়তায় অনিয়ম-দুর্নীতির ধরন

অনিয়ম-দুর্নীতির ধরন	(%)
তালিকায় নাম থাকা সত্ত্বেও টাকা না পাওয়া	৬৯.০
মোবাইল ব্যাংকিং এজেন্ট কর্তৃক কমিশন/ফি কেটে রাখা	২৬.৬
মোবাইল ব্যাংকিং একাউন্ট চালু করতে খরচ	২.৪
অন্যান্য (টাকা নিজে তুলি নাই, পরিবারের অন্য সদস্য তুলেছে)	১.৫

৯.২.২ ওএমএস (চাল) সহায়তার ক্ষেত্রে অনিয়ম-দুর্নীতি: জরিপে ওএমএস (চাল) সহায়তায় উপকারভোগীদের ১৫ শতাংশ চাল পেতে অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছিল। এক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরনের মধ্যে ছিল, পরিমাণে কম দেওয়া (৩৬.৮%), তালিকায় নাম থাকা সত্ত্বেও চাল কিনতে না পারা (২০.৬%), ওজন না করে বালতিতে অনুমান করে চাল দেওয়া (১৯.৯%) ইত্যাদি।

সারণি ১৭: ওএমএস কার্ডে অনিয়ম-দুর্নীতির ধরন

অনিয়ম-দুর্নীতির ধরন	%
পরিমাণে কম দিয়েছিল	৩৬.৮
তালিকায় নাম থাকা সত্ত্বেও চাল কিনতে না পারা	২০.৬
ওজন না করে বালতিতে অনুমান করে চাল দেওয়া	১৯.৯
এখনো একবারও চাল পায় নি	৯.৬
অন্যান্য	৭.৪
স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে পরিচিতদের পরিমাণে বেশি/একাধিকবার চাল দেওয়া	৫.৯

৯.৩ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে অনিয়ম-দুর্নীতির সাথে জড়িত ব্যক্তি

নগদ সহায়তা কার্যক্রমে অনিয়ম-দুর্নীতির সাথে জড়িত ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি (সংসদ সদস্য / মেয়র/ ইউপি চেয়ারম্যান/ মেম্বার/ কাউন্সিলর) (৭৯.২%) ও স্থানীয় প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা (৪৮.৭%) এবং বিশেষ ওএমএস (চাল) বিতরন কার্যক্রমে অনিয়ম ও দুর্নীতির সাথে জড়িত ব্যক্তিদের মধ্যে (সংসদ সদস্য / মেয়র/ ইউপি চেয়ারম্যান/ মেম্বার/

[৯০] বিস্তারিত, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, তারিখ ২৫ আগস্ট ২০২০

কাউন্সিলর) (৬৫.৭%) ও স্থানীয় প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতার (৪০.১%) সম্পৃক্ততা ছিল বলে জানায় সুবিধাভোগীরা। করোনাকালীন যেসব জনপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে দুনীতির প্রমান মিলেছে, তাদের ৯০ জনই ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জড়িত ছিল।[৯১] একটি প্রতিবেদন হতে জানা যায়, দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) সরাসরি ও হটলাইনের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত জনপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় যে, তারা প্রকৃত দুস্থদের বঞ্চিত করে করোনাকালে সরকারের দেওয়া ত্রাণ ও নগদ অর্থ সহায়তাসহ বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির অর্থ আত্মসাত করেছেন।[৯২]

সারণি ১৮: অনিয়ম-দুর্নীতির সাথে জড়িত ব্যক্তির ধরন

অনিয়ম-দুর্নীতির সাথে জড়িত ব্যক্তি	নগদ সহায়তা (%)	ওএমএস-চাল (%)
এমপি/মেয়র/ইউপি চেয়ারম্যান/মেম্বার/কাউন্সিলর	৭৯.২	৬৫.৭
স্থানীয় প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা	৪৮.৭	৪০.১
বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা- কর্মচারি	৪.০	৭.৩
স্থানীয় মোবাইল ব্যাংকিং এজেন্ট/ডিলার	৫.৮	২১.২

৯.৪ অনিয়ম-দুর্নীতির সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ

করোনাকালীন মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে অনিয়ম ও দুর্নীতি রোধে এ পর্যন্ত শতাধিক জনপ্রতিনিধিকে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় সাময়িক বরখাস্ত[৯৩] করে। তবে জনপ্রতিনিধিদের অনেকেই (অন্তত ৩০ জন) উচ্চ আদালতে রিটের মাধ্যমে তাদের স্বপদে ফিরে এসেছে। অনেকক্ষেত্রে আদালতে জোরালোভাবে তথ্য উপস্থাপন না করা, সরকার পক্ষের আইনজীবী আদালতে উপস্থিত না হওয়া, আসামিপক্ষ বা বরখাস্ত চেয়ারম্যানদের পক্ষের আইনজীবীরা জোরালোভাবে বরখাস্তের বিরুদ্ধে তাদের অবস্থান তুলে ধরার প্রেক্ষিতে আদালত সরকারের বরখাস্ত আদেশ স্থগিত করে রায় দেন।[৯৪] এ প্রসঙ্গে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী এক প্রতিবেদনের মাধ্যমে জানান, প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত নিয়ে সরকারপক্ষ আদালতে আপিল করবে, সরকারপক্ষের আইনজীবীদের আরও সিরিয়াস হতে বলা হবে এবং কিছু আইনজীবী পরিবর্তনও করা হবে।[৯৫]

৯.৫ উপসংহার

করোনা ভাইরাস পরিস্থিতিতে কর্মহীন হয়ে পড়া দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত ব্যক্তি/পরিবারকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন সহায়তার উদ্যোগ নেওয়া হলেও উপকারভোগীর তালিকাভুক্তি ও সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে সংঘটিত নানা অনিয়ম-দুর্নীতির কারণে প্রকৃত দুস্থ ও অতি দরিদ্র ব্যক্তি ও পরিবারের কাছে এই ত্রাণ সহায়তা পৌঁছাচ্ছে না। একইসাথে অনিয়ম-দুর্নীতির সাথে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধেও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না।

[৯১] দৈনিক প্রথম আলো, ২৩ জুন ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: https://www.prothomalo.com/opinion/editorial/,
[৯২] দৈনিক ভোরের কাগজ, ৭ আগস্ট, ২০২০ বিস্তারিত, বিস্তারিত দেখুন: https://www.bhorerkagoj.com/2020/08/07/, https://www.dailyinqilab.com/article/317234/
[৯৩] দৈনিক ইনকিলাব, বিস্তারিত দেখুন: https://www.dailyinqilab.com/article/317234/; দৈনিক প্রথম আলো, https://www.prothomalo.com/opinion/editorial/জনপ্রতিনিধিদের-ত্রাণ-দুর্নীতি
[৯৪] বাংলাদেশ প্রতিদিন, বিস্তারিত দেখুন: https://www.bd-pratidin.com/first-page/2020/09/23/569469
[৯৫] প্রাগুক্ত

দশম অধ্যায়

করোনা মোকাবিলাঃ সুশাসনের আঙ্গিকে চ্যালেঞ্জ বিশ্লেষণ

পূর্বের গবেষণায় করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় প্রাক-সংক্রমণ প্রস্তুতিমূলক পর্যায়ে ও সংক্রমণ শুরুর প্রথম তিন মাসে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সুশাসনের প্রতিটি নির্দেশকের ক্ষেত্রে ব্যাপক ঘাটতি লক্ষ করা যায়। করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় পর্যাপ্ত সময় হাতে পেয়েও প্রস্তুতি ও পরিকল্পনার ঘাটতি, সমন্বয়ের ঘাটতি, সক্ষমতার ঘাটতি, অনিয়ম-দুর্নীতি এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতির কারণে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ বিস্তার লাভ এবং চিকিৎসা ব্যবস্থাপনায় সংকট সৃষ্টি করে।

পূর্বের গবেষণার ধারাবাহিকতায় বর্তমান সময়ে করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সরকার কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সুশাসনের কয়েকটি নির্দেশক তথা আইনের শাসন, সাড়াদান, সক্ষমতা ও কার্যকরতা, অংশগ্রহণ ও সমন্বয়, স্বচ্চতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতি এবং অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণ আলোচনা করা হলো।

১০.১ প্রাসঙ্গিক আইন অনুসরণ না করা

করোনা ভাইরাস মোকাবিলার ক্ষেত্রে পরিকল্পনা ও কৌশল প্রণয়নে দেশে বিদ্যমান আইন ও বিধি-বিধান অনুসরণ করা হয় নি। উক্ত আইন ও বিধি-বিধানে দুর্যোগ-মাহমারি মোকাবিলায় যেসব প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো রয়েছে তা ব্যবহার না করে নতুন করে বিভিন্ন কমিটি প্রণয়ন করা হয়। বিক্ষিপ্তভাবে অপ্রয়োজনীয় ও বিপুল সংখ্যক কমিটি গঠন করা হলেও তার অধিকাংশ অকার্যর ছিল, এবং অনেক ক্ষেত্রে আমলা নির্ভর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। মহামারি প্রতিরোধে বিদ্যমান আইন অনুসরণ না করায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার ক্ষেত্রে আইনগত বাধ্যবাধকতা আরোপ করা যায় নি। এছাড়া করোনাকালীন সরকারি ক্রয়ে আইন ও বিধি অনুসরণ না করায় এক্ষেত্রে ব্যাপক অনিয়ম-দুর্নীতি সংঘটিত হয়। করোনা মোকাবিলায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই সুনির্দিষ্ট কৌশল ও পরিকল্পনা থাকলেও এখনো তা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে না।

১০.২ সমন্বয়হীনতা

করোনা মোকাবিলায় আক্রান্ত চিহ্নিতকরণ, কোভিড চিকিৎসা, কমিউিনিটি পর্যায়ে সংক্রমণ রোধ, ত্রাণ ও মানবিক সহায়তা ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রে জাতীয় ও স্থানীয় উভয় পর্যায়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়হীনতা চলমান রয়েছে। বিশেষকরে স্থানীয় পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও প্রশাসন বিভাগের মধ্যে যোগাযোগ ও সমন্বয়ের ঘাটতি বৃদ্ধি পেয়েছে। করোনা সংক্রান্ত অর্ধশতাধিক কমিটি করা হলেও তাদের মধ্যেকার সমন্বয় নেই, বিশেষজ্ঞ কমিটির পরামর্শ গ্রহণ করা হয় না, জাতীয় কমিটির সাথে এ সকল কমিটির যোগাযোগ ও সমন্বয়ের ঘাটতি লক্ষ করা গেছে। ফলে করোনাভাইরাস মোকাবিলার সকল কার্যক্রমে কেন্দ্রীভূত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রবণতা চলমান রয়েছে। এখন পর্যন্ত বেসরকারি মেডিকেল কলেজ, হাসপাতাল ও ক্লিনিকগুলোকে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের চিকিৎসা ব্যবস্থায় সরকারি হাসপাতালের সাথে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার ভিত্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয় নি। বিচ্ছিন্ন ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাণিজ্যিকভাবে এ সকল প্রতিষ্ঠান সেবা প্রদান করছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও বারবার সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের কারণে করোনার এন্টিবডি ও এন্টিজেন টেস্ট অনুমোদনেই চার মাস অতিবাহিত হয়েছে। পরবর্তীতে অনুমোদনের একমাস পরেও এ পদ্ধতিতে পরীক্ষা শুরু করা সম্ভব হয় নি। স্থানীয় সংসদ সদস্যদের ত্রাণ ও নগদ সহায়তা কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা হয় নি। এক্ষেত্রেও প্রশাসনের ওপর নির্ভরশীলতার প্রবণতা রয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়হীনতার কারণে সারা দেশে লকডাউন কার্যকর করা সম্ভব হয় নি।

১০.৩ সক্ষমতা ও সাড়া প্রদানে ঘাটতি

করোনা মোকাবিলায় আক্রান্ত চিহ্নিতকরণ, কোভিড চিকিৎসা, কমিউিনিটি পর্যায়ে সংক্রমণ রোধ, ইত্যাদি ক্ষেত্রে এখনো সক্ষমতার ঘাটতি বিদ্যমান। করোনা পরিস্থিতি বিবেচনায় সক্ষমতা পর্যালোচনা, এলাকা ভিত্তিক চাহিদা যাচাই সাপেক্ষে ঘাটতি দূর করতে যথেষ্ট উদ্যোগের ঘাটতি লক্ষ করা গেছে। প্রান্তিক ও ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় দ্রুততার সাথে সেবা সম্প্রসারণ না করে শহরকেন্দ্রিক বাণিজ্যিক সেবা সম্প্রসারণ করা হয় নি। ফলে সুবিধা-বঞ্চিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এসব সুবিধা হতে বঞ্চিত হয়েছে।

১০.৪ স্বচ্ছতার ঘাটতি

সরকারি ক্রয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতে এবং দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে ক্রয় কার্যক্রমের সকল ক্ষেত্রে তথ্য সংরক্ষণ ও তথ্যের উন্মুক্ততা গুরুত্বপূর্ণ হলেও কোভিড-১৯ মোকাবেলায় চিকিৎসা সামগ্রী ক্রয়ে প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশে ঘাটতি রয়েছে। যেমন, ক্রয় সংক্রান্ত চুক্তিপত্র প্রকাশ না করা, চুক্তিবদ্ধ কোম্পানির নাম/তালিকা প্রকাশ না করা, কার্যাদেশপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান ও মালিকের বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ না করা, সরবরাহকৃত পণ্য ও সেবার মান যাচাইকরণ দলিল প্রকাশ না করা ইত্যাদি।

সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে জনসাধারণকে সচেতন ও সতর্ক করার জন্য নির্দিষ্ট সময়ে সঠিক তথ্যের সরবরাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। করোনাকালে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক টেলিভিশনের মাধ্যমে সরাসরি প্রচারিত করোনা সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য জনসাধারণকে সংক্রমণের বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে আরও অধিক সচেতন ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়ক হিসেবে কাজ করছে বলে আশা করা যায়। কিন্তু ইতোমধ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত সম্প্রচারিত অনলাইন বুলেটিনটি ১২ আগস্ট ২০২০ থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়।[৯৬] প্রতিদিনের এই বুলেটিনে করোনা বিষয়ক নিয়মিত তথ্য ছাড়াও বিভিন্ন সচেতনতামূলক বার্তা দেওয়া হতো। এছাড়া সংক্রমণ পরিস্থিতির উন্নতি দাবি করে অধিদপ্তর হতে টেলিভিশনে প্রচারিত নিয়মিত বুলেটিনটি বন্ধ করে দেওয়া হয়, যদিও করোনা সংক্রমণ শনাক্ত এবং মৃত্যুর হার প্রত্যাশিত পর্যায়ে কমেনি।

মতামত প্রকাশের অধিকারকে বাংলাদেশের সংবিধানে মৌলিক অধিকার এবং সরকারর নির্বাচনী ইশতেহারে (২০১৮) গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও অবাধ তথ্য প্রবাহের অধিকার সুরক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।[৯৭] করোনাকালীন সরকারি কর্মচারি কর্তৃক করোনা বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য ও মতামত গণমাধ্যমে (বেসরকারি বিভিন্ন টেলিভিশনের সংবাদ, টক শো, আলোচনা অনুষ্ঠান, পত্র-পত্রিকা বা অন-লাইন মাধ্যমে) তুলে ধরলে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের এক নির্দেশনায় সরকারি কর্মচারি (আচরণ) বিধিমালা ১৯৭৯ এর (বিধি-২২)[৯৮] বিষয়টি সামনে এনে মত প্রকাশে বিধি নিষেধ আরোপ করা হয় যা তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা এবং অনিয়ম-দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনাকে আড়াল করে।

মত প্রকাশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ এর ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গেছে। করোনাকালীন উক্ত আইন ব্যবহারের ব্যাপকতা লক্ষ করা যায়। আর্টিকল-১৯ এর তথ্য অনুযায়ী, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের আওতায় ২০২০ সালের প্রথম নয় মাসে (সেপ্টেম্বর ২০২০) ২৯১ জনের বিরুদ্ধে মোট ১৪৫ টি মামলা করা হয়। যার মধ্যে ৬০ জন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে ৩৪টি মামলা করা হয় এবং ৩০ জন সাংবাদিককে গ্রেফতার করা হয়। ডিজিটাল আইনে যে মামলাগুলো হয়েছে সেগুলোর তিন-চতুর্থাংশের বেশি অভিযোগ সরকার, সরকারি দলের লোকজন এবং সরকারের কাজকর্ম নিয়ে সমালোচনামূলক মন্তব্যেও প্রেক্ষিতে। এছাড়া করোনাকালীন বিভিন্ন বিষয়ে মত প্রকাশে গণমাধ্যমগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও বিভিন্ন গণমাধ্যমের অনলাইন পোর্টালকে নতুন করে নিবন্ধনের বাধ্যবাধকতা রেখে 'জাতীয় অনলাইন গণমাধ্যম নীতিমালা, ২০১৭' সংশোধন করা হয় যা মুক্ত সাংবাদিকতা ও অবাধ তথ্য প্রবাহে প্রতিবন্ধকতার ঝুঁকি সৃষ্টি করে। অধিকন্ত নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ (জাতীয় সম্প্রচার কমিশন) গঠন এবং অনলাইন গণমাধ্যম নীতিমালা (সংশোধিত) চূড়ান্ত না করেই গণমাধ্যমগুলোকে নতুন করে নিবন্ধনের নির্দেশ সংবাদ মাধ্যমের ওপর সরকারের 'সর্বাত্মক নিয়ন্ত্রণ ও হস্তক্ষেপ' প্রতিষ্ঠার আশঙ্কা সৃষ্টি করেছে।

১০.৫ জবাবদিহিতার ঘাটতি

করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় বিশেষত করোনা পরীক্ষা, চিকিৎসা সেবা, সরকারি ক্রয়, ত্রাণ ও মানবিক সহায়তা কার্যক্রম ইত্যাদি ক্ষেত্রে এখনো ব্যাপকভাবে অনিয়ম-দুর্নীতি, দায়িত্বে অবহেলা লক্ষ করা যাচ্ছে। কিন্তু করোনাকালীন সংঘটিত এ সকল অনিয়ম-দুর্নীতির ক্ষেত্রে সরকারের জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে কোনো ধারাবাহিক উদ্যোগ লক্ষ করা যায় না।

স্বাস্থ্যখাতে বিশেষত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে জবাবদিহি নিশ্চিত করার অন্যতম একটি জায়গা হতে পারতো স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির। করোনাকালে এই কমিটির কোনো ভূমিকা লক্ষ করা যায় নি। ২৪ মার্চ ২০২০ এর পর থেকে এই কমিটি কোনো সভা করে নি।

করোনাকালে স্বাস্থ্য খাতে বিভিন্ন সরকারি ক্রয়ে ব্যাপক অনিয়ম-দুর্নীতি সংঘটিত হয়। যার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফলাফল হিসেবে করোনা আক্রান্ত রোগী ও স্বাস্থ্যকর্মীদের আক্রান্ত হওয়া, মৃত্যু হওয়া এবং ব্যাপক হয়রানি হওয়া। কিন্তু রিজেন্ট হাসপাতাল ও জিকেজি এর মতো দু-একটি ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়া করোনা মোকাবিলা কার্যক্রমে অনিয়ম-দুর্নীতির সাথে জড়িত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কোনো কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বদলি ও চলতি দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি ব্যতীত আর কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি। উপরন্ত সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকে বিভিন্ন সময়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে এসব অভিযোগের দিকে নজর না দিয়ে তাদের কাজে মনোনিবেশ করতে বলা হয়। একটি দুর্নীতিতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের উচ্চপদস্থ দুইজন কর্মকর্তার প্রত্যক্ষ সম্পৃক্ততার (মৌখিক আদেশ) অভিযোগ থাকলেও দুদকের মামলায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। অভিযুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে বদলি ছাড়া অন্য কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি। বেসরকারি হাসপাতালে করোনা সেবার অজুহাতে কয়েকগুণ বেশি সার্ভিস চার্জ গ্রহণ ও চিকিৎসা সরঞ্জামের অনিয়ন্ত্রিত বাজার অব্যাহত থাকলেও তাদের জবাবদিহিতার আওতায় আনা হয় নি। ৪ আগস্ট ২০২০ হতে স্বাস্থ্যসেবা ব্যাহত হওয়ার অজুহাতে অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধে বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর অভিযানে পূর্ব অনুমতি গ্রহণের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়।

---

[৯৬] বিস্তারিত, https://www.prothomalo.com/bangladesh/

[৯৭] বিস্তারিত, http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-details-957.html;
https://mora.gov.bd/site/notices/a5407755-e12d-440a-b16f-6756fc1afab4/

[৯৮] বিস্তরিত, https://dghs.gov.bd/index.php/bd/?start=10, তারিখ ১৮ আগস্ট ২০২০

১০.৬ উপসংহার

করোনা মোকাবিলা কার্যক্রমে সক্ষমতার ঘাটতি পর্যালোচনা সাপেক্ষে যথাযথ সাড়া প্রদান না করা, আইনের যথাযথ অনুসরণ না করা, সমন্বয়, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতির ফলে সকল কার্যক্রমের ক্ষেত্রে অব্যবস্থাপনা পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং যথাযথভাবে পরিকল্পনা ও কৌশল বাস্তবায়ন করে করোনা ভাইরাসকে নির্মূল করা সম্ভব হচ্ছে না। এসব ঘাটতির কারণে করোনা মোকাবিলার প্রতিটি কার্যক্রমে অনিয়ম-দুর্নীতি সংঘটিত হচ্ছে। মানুষের দুর্ভোগ অব্যাহত থাকছে এবং করোনা দীর্ঘ মেয়াদে থাকার ঝুঁকি সৃষ্টি হচ্ছে।

একাদশ অধ্যায়

উপসংহার

১১.১ সার্বিক পর্যবেক্ষণ

করোনা মোকাবিলায় সরকারের কিছু কার্যক্রমে উন্নতি হলেও পূর্বের গবেষণার ধারাবাহিকতায় করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সরকারের গৃহীত কার্যক্রমে সুশাসনের প্রতিটি নির্দেশকের ক্ষেত্রে ব্যাপক ঘাটতি এখনো বিদ্যমান। স্বাস্থ্যখাতে ইতিমধ্যে গভীরভাবে বিস্তৃত দুর্নীতি করোনা সংকটে প্রকটভাবে উন্মোচিত হয়েছে, এবং করোনা সংকটকে কেন্দ্র করে দুর্নীতির নতুন সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। করোনা পরীক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা, ত্রাণ কার্যক্রমে সংকট এখনো চলমান। সংঘটিত এসব অনিয়ম-দুর্নীতির কারণে স্বাস্থ্য খাতের ওপর মানুষের অনাস্থা তৈরি হয়েছে। একইভাবে সরকারের ত্রাণসহ প্রণোদনা কর্মসূচি থেকেও অনিয়ম-দুর্নীতি ও সুবিধা লাভের প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। মাঠ পর্যায়ের অনিয়ম-দুর্নীতির কারণে বিতরণকৃত ত্রাণ হতে প্রকৃত উপকারভোগীরা বঞ্চিত হচ্ছে।

অনিয়ম-দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্তদের মধ্যে উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিদের রাজনৈতিক বিবেচনায় আড়াল করা হচ্ছে এবং এক্ষেত্রে কিছু ব্যক্তির বিরুদ্ধে লোক দেখানো ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। এছাড়া তথ্য প্রকাশে বিধিনিষেধ আরোপের মাধ্যমেও অনিয়ম-দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনাকে আড়াল করার প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। সরকারের সংকোচনমূলক নীতি প্রয়োগের (সেবা ও নমুনা পরীক্ষা হ্রাস) মাধ্যমে শনাক্তের সংখ্যা হ্রাস হওয়াকে 'করোনা নিয়ন্ত্রণ' হিসেবে দাবি এবং রাজনৈতিক অর্জন হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। করোনা ভাইরাস মোকাবিলার প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিশেষজ্ঞ মতামত উপেক্ষা করে এখনো আমলানির্ভর সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রবণতা বিদ্যমান। শহরকেন্দ্রিক ও বেসরকারি পর্যায়ের বাণিজ্যিক সেবা সম্প্রসারণ, পরীক্ষায় ফি নির্ধারণ দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে এই সেবা থেকে বঞ্চিত করছে এবং হয়রানি ও অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি করছে। নমুনা পরীক্ষা, চিকিৎসা এবং করোনার অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবিলায় গৃহীত প্রণোদনা কর্মসূচির ক্ষেত্রেও সমাজের সুবিধাপ্রাপ্ত অংশের অনুকূলে পক্ষপাত করা হচ্ছে এবং চিকিৎসা সেবা ও প্রণোদনার সুফল সাধারণ মানুষের কাছে এখনো পৌঁছেনি।

১১.২ সুপারিশ

আইনের শাসন, পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি

১. স্বাস্থ্য খাতের সব ধরনের ক্রয়ে সরকারি ক্রয় আইন ও বিধি অনুসরণ করতে হবে। জরুরিসহ সকল ক্রয় ই-জিপিতে করতে হবে।

২. করোনা সংক্রমণের সম্ভাব্য দ্বিতীয় পর্যায়ের আঘাত মোকাবিলায় বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

সক্ষমতা বৃদ্ধি

৩. বিনামূল্যে নমুনা পরীক্ষার সুবিধা সকল জেলায় সম্প্রসারণ করতে হবে, নমুনা পরীক্ষার সংখ্যা বাড়াতে হবে।

৪. ব্যবহৃত সুরক্ষা সামগ্রীসহ চিকিৎসা বর্জ্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে; সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

অংশগ্রহণ ও সমন্বয়

৫. সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রয়োজনে বেসরকারি হাসপাতালের সেবাসমূহকে (আইসিইউ, ভেন্টিলেটর ইত্যাদি) করোনা চিকিৎসা ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৬. বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশ গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সরকারি দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি করতে হবে।

৭. দেশজুড়ে প্রান্তিক ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে সহযোগিতার জন্য সরকারি বিভিন্ন কার্যক্রমের পাশাপাশি বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা

৮. সংসদীয় স্থায়ী কমিটিকে নিয়মিত সভা করতে হবে এবং করোনায় সংঘটিত অনিয়ম-দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।

৯. করোনা সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশে যে বিধি-নিষেধ দেওয়া হয়েছে তা বাতিল করতে হবে।

১০. গণমাধ্যমসহ বিভিন্নভাবে সরকারি ক্রয়, করোনা সংক্রমণের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ, ত্রাণ ও প্রণোদনা বরাদ্দ ও বিতরণ ইত্যাদি বিষয়ে অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করতে হবে।

১১. ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাতিল বা সংশোধন করতে হবে এবং হয়রানিমূলক সব মামলা তুলে নিতে হবে।

১২. বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির উপকারভোগীদের তালিকা যাচাই-বাছাই ও হালনাগাদ করতে হবে এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

১৩. স্বাস্থ্যখাতে ক্রয়ে তদারকি বৃদ্ধি করতে হবে এবং অনিয়ম-দুর্নীতিতে জড়িত ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।

১৪. সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম প্রক্রিয়ায় অনিয়ম ও দুর্নীতির সাথে জড়িত সাময়িক বরখাস্ত জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য-প্রমাণসহ মামলা পরিচালনা করতে হবে। এসব জনপ্রতিনিধিদের পরবর্তী যেকোনো নির্বাচনে অংশ নেওয়ার যোগ্যতা বাতিল ঘোষণা করতে হবে।

১৫. সম্মুখসারির সব স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রাপ্য প্রণোদনা দ্রুত বিতরণের ব্যবস্থা করতে হবে।

****